ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো

মরিয়ম জামিলা

ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেস্টো

মরিয়ম জামিলা

অনুবাদ ঃ আবদুল আউয়াল

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮৮

১ম প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৮
অগ্রহায়ণ	১৪১৪
ডিসেম্বর	২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ২৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI ANDOLONER MENYFASTO by Maryam Jameelah. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 27.00 Only.

www.amarboi.org

উৎসর্গ

অগ্রজ

অধ্যাপক আবদুস সাত্তারকে

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ কথা

A Manifesto of the Islamic Movement" প্রথম করাচী থেকে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে এর কয়েকটি সংস্করণ বের হয়। বইটি আমার হাতে আসে প্রথম প্রকাশের এক দশক পরে।

বইটি মুক্তিকামী বাংগালি মুসলমানদের পাঠ্য বলে মনে হওয়ায় আমি এর অনুবাদ করি। এতে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। নব্যপুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজবাদী সম্প্রসারণবাদের অভিশাপ ও তা থেকে মুক্তি লাভের পথ সম্পর্কেও সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে।

এর অনূদিত পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ সাপ্তাহিক কিস্তিতে দৈনিক সংগ্রামে ১৯৮১-৮২ সালে প্রকাশিত হয়। শেষাংশ বের হয় মাসিক 'পৃথিবী'তে। এতোদিন সম্পূর্ণ অনুবাদটি বই আকারে প্রকাশ করা বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়নি। এবারে আধুনিক প্রকাশনী এ উদ্যোগ নেয়ায় আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মরিয়ম জামিলার অন্যান্য লেখার চেয়ে মেনিফেস্টোর ভাষা বেশ কঠিন বলে মনে হয়েছে। মিলটনীয় ঢংয়ে লেখা। কোথাও কোথাও প্রায় পাতাজুড়ে এক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য। আমি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে সহজ করে লেখার চেষ্টা করেছি।

জনাব মিয়াঁ মোহাম্মদ আইয়ুব আমাকে বইটি অনুবাদের প্রেরণা দিয়েছেন এবং পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারেও সহায়তা করেছেন। জনাব ফজলুর রহমান ও বন্ধু মমিনুল হক অনূদিত পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন। শ্রদ্ধাবর প্রফেসর ভূমিকা লিখে দিয়ে এ অনুবাদটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। এদের সবার কাছেই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা, ৮ই জুলাই ১৯৮৬ —অনুবাদক

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইসলাম গ্রহণের (১৯৬১) পর থেকে মরিয়ম জামিলা (পূর্বনাম-মার্গারেট মারকিউস) ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রসারে স্মরণীয় অবদান রাখছেন। এ শতকের ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ ও সুর সামগ্রিকভাবে তাঁর লেখায় প্রকট হয়ে উঠেছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও 'ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো' তাঁর একটি প্রতিনিধিত্বশীল রচনা।

কমিউনিস্ট মেনিফেষ্টোতে মার্কস-এঙ্গেলস যেমন সাম্যবাদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টোতে মরিয়ম জামিলাও তেমনি ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা ব্যাখ্যা করেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি যুগযুগ ধরে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে জীবন সমস্যার সমাধান কল্পে মনীষীরা যেসব মত ও পথ, তত্ত্ব ও মতবাদ আবিষ্কার করেছেন সে সবের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান কয়েকটি মতবাদের অসারতাও তুলে ধরেছেন তথ্য বহুল আলোচনায়। বিশেষ করে পুঁজিবাদ ও ইহুদীবাদের কবলে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের তথা মুসলিম বিশ্বের অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন নিপুণভাবে। সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকল থেকে, পুঁজিবাদ সমাজবাদ ও জায়নবাদের বন্দীত্ব থেকে মানবতার মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন ইসলামকে। সর্বক্ষেত্রে জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তিরূপে তিনি চিহ্নিত করেছেন ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে। তাঁর মতে "সার্বজনীনভাবে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মনে প্রাণে গ্রহণ করাই বিশ্বের জাতিসমূহের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জনের একমাত্র উপায়।

সম্পদের সুষম বন্টন প্রশ্নের একটা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়াস চলে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। আজকের বিশ্বে এ প্রশ্ন আরো জটিল। এ প্রসঙ্গে লেখিকার বক্তব্য "একমাত্র নৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্পদের সমবন্টন অর্জন করা যেতে পারে।" ইসলামের মতো এ নৈতিক বিপ্লবের কোনো উৎকৃষ্ট বিকল্প নেই।

এক সময় ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দিন ছিল। বর্তমানে এর যে পতন ও দুর্দশা তা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টাও চলেছে পুরোদমে। এ প্রচেষ্টার সাথে নৈতিক বিপ্লব তথা ইসলামী বিপ্লব আনার চেতনাকে প্রতিটি মুসলমানের

www.amarboi.org

অন্তরে দৃঢ়মূল করার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এতে রয়েছে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের ওপর যুক্তি নির্ভর বুদ্ধিদিপ্ত আলোচনা। আর তাই এটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু বাংলাভাষাভাষীদের জন্য গ্রন্থটির অনুবাদ এ যাবত হয়নি। এ অনুবাদ ইসলামের সঠিক মেজাজের সাথে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের যোগাযোগের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে।

❐

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকগণ ঘোষণা করেন, যুক্তিসিদ্ধ মানসিক শক্তির নির্ভেজাল প্রয়োগের মাধ্যমেই মানবজাতি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। তারা আরো নিশ্চিত করে বলেন, মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ নির্ভর করে তার কর্মে, ধর্মবিশ্বাসে নয়। আর ধর্মবিশ্বাসের সাথে সে নৈতিকতার কোনো সামঞ্জস্য নেই। পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সের মানবতাবাদী দার্শনিকগণ একটি তত্ত্ব প্রমাণ করতে এগিয়ে আসেন। তা হলো যদি কোনো বাইরের কর্তৃত্বের বাধা না পেয়ে ব্যক্তির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন ও সৃজন-প্রতিভার বিকাশ জীবনের চরম লক্ষ হিসেবে গৃহীত হয়, তাহলে পৃথিবী এক আনন্দময় জগতে পরিণত হবে। এর এক শতাব্দী পরে স্যার ফ্রান্সিস বেকন তাঁর 'নিউ এ্যাটলান্টিস' গ্রন্থে একথা সুনিশ্চিত করে বলেন, বিজ্ঞানকে অবশ্যই অনিবার্যভাবে ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। আর এ বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব এনে দিয়ে শীঘ্রই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির এক পার্থিব স্বর্গের সূচনা করবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, বিজ্ঞান, মৃত্যু, বার্ধক্য, রোগ, দারিদ্র ও যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটাবে এবং তারপর মানুষ বেঁচে থাকবে চিরকাল ধরে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে একদল মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। ধর্ম ছিলো তাদের বলির পাঠা। তাঁরা বলেন, ধর্মের বিলোপ সাধনই আমাদের প্রথম কর্তব্য। তারপর কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। তখন ধর্মীয় গোঁড়ামী বিবর্জিত মানুষ উৎপীড়নের মূলোৎপাটন করবে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ হবে অসভ্য অতীতের উপকথা। পৃথিবীতে মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল' এবং এর 'অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা' নিয়ে আসেন ইউরোপীয় দর্শনের মঞ্চে। কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক আভিজাত্য উচ্ছেদ করে দিলে সামাজিক অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটবে। আর এ পৃথিবী রূপান্তরিত হবে এক শ্রমিকের স্বর্গে, এই ছিলো তার বাণী। বিংশ শতাব্দীতে এসে ফ্রয়েড বললেন, আমাদের কেবল সবরকম সংযম ও লজ্জাবোধের সাথে যৌন আচরণের ওপর আরোপিত সামাজিক বাধা-নিষেধ উৎখাত করা প্রয়োজন। তাহলে সমস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুবিক ক্লেশ ও মানসিক ব্যাধি আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। তাঁর মতে এটাই ছিলো সার্বজনীন সুখ-শান্তির

www.amarboi.org

নিয়ামক। এভাবে জড়বাদের প্রবক্তারা একটি ভূ-স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন আড়াই হাজার বছর ধরে।

আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এ স্তরে পৌঁছে এ প্রশ্নটি অবশ্যই মনে জাগবে। এতো শতাব্দী পরেও তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি কেনো ? দু'হাজার পাঁচশত বছর নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সময়েরও অনেক বেশী সময়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগত যখন এতোদিন জড়বাদীদেরকে তাদের দাবী পূরণের সবরকম সুযোগ দিয়েছে, তখন এটা অনস্বীকার্য যে, তারা অনেক অনেক সময় পেয়েছে। তবুও এটা সার্বজনীন সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং অনস্বীকার্য সত্য যে, এতোসব বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাদান সত্ত্বেও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবরকমের দৃশ্যমান প্রগতি সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীতে অনেক বেশী গুণে বিরাজ করছে দ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, শোষণ, অন্ধ অনুকরণ ধর্মান্ধতা, দুঃখ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, দারিদ্র আর সামাজিক অবিচার। আড়াই হাজার বছর ধরে জড়বাদ অনুশীলনের পরিণতি যদি এটাই হয়, তবে অবশ্যই এর মধ্যে মারাত্মক ভ্রান্তিপূর্ণ কিছু রয়ে গেছে।

সমকালীন চিন্তা নায়করা জানাচ্ছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা ঠিকই সঠিক পথে এগিয়ে গেছে। সে আধুনিক উন্নতিশীল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। আর ইসলামী সভ্যতা নিরাশভাবে পেছনে পড়ে আছে। তা মধ্যযুগীয় এবং সেকেলে। তারা একথাও বলেন, যেহেতু মধ্যযুগের আরব দেশে মহানবী স. যেসব জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা থেকে আধুনিক জীবনের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে আলাদা, সেহেতু কুরআন হাদীসের শিক্ষা সেই বিশেষ স্থান-কালের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। আজকের দিনে আমাদের জন্য ওগুলোর কোনো বাস্তবমূল্য সম্ভবত নেই। তাই পাশ্চাত্যে প্রাচ্যের কিছু কিছু প্রবাসী এ ধরনের যুক্তি দেখিয়ে বলেন, যতোশীঘ্র আমরা সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করবো অথবা ইসলামকে অনাধ্যাত্মিক অর্থাৎ অপবিত্র করবো, ততোশীঘ্রই আমাদের জনগোষ্ঠী মুক্তি পাবে পশ্চাদপদতা বা অনুন্নতি থেকে এবং মহানন্দ লাভ করবে আধুনিক স্বপ্নরাজ্যে বসাবস করে।

সমকালীন ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মবেত্তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যতোই উৎকৃষ্ট হোক না কেনো, কোনো মতবাদ বা শিক্ষা বা জীবন ব্যবস্থাই এ পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। তাদের একথার অসারতা প্রমাণ করে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এবং তা হলো বর্তমান যুগের মানুষের আর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তার গুহাবাসী পূর্বপুরুষের দেহমন অভিন্ন। এর

www.amarboi.org

একটুও পরিবর্তন হয়নি। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত তার সূক্ষ্মতম জৈবিক পরিবর্তন ঘটেনি। (Homosapiens has not been subject to slightest biological change) গুহাবাসী মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং মহাশূন্যচারী মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি একই। প্রস্তর যুগ এবং জেট যুগের মানবীয় কোনো পার্থক্য নেই। মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য, যা মানুষের সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করে বা অসৎকর্মে প্রলোভিত করে, তা কখনো পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না। তার দৈহিক, ভাবোদ্দীপক ও আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলো যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত আছে। অতএব ঐ ধৃষ্ট বক্তব্যে বারবার কি সত্যের অবতারণা করা হচ্ছে যা আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য কল্যাণজনক ছিলো এবং আমাদের জন্য অকল্যাণজনক হবে?

পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। কেবল এ কারণেই সে অন্যান্য সভ্যতার ওপর সব বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্য বজায় রাখবে এ হচ্ছে আধুনিকতাবাদীদের স্বতসিদ্ধ ধারণা। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত শিল্প বিষয়ক ও বাণিজ্যিক অপশক্তির সাথে সংস্কৃতির নৈতিক ভিত্তির আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর, আর যাই হোক, সম্পর্ক নেই। মর্ডানিষ্টদের দৃষ্টিতে ইসলামকে ভ্রান্ত বলার কারণ এ নয় যে, এটা মিথ্যা। আর একমাত্র কারণ এটা পাশ্চাত্য জীবনরীতির পরিপন্থী। এ জড়বাদের যুগে কারও স্বার্থকে আল্লাহর বিচারের ওপর ছেড়ে দেয়া বা কারো ভাগ্যের সাথে পরকালের সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত সেকেলে কর্ম। আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এবং পরকালের চিরন্তন মুক্তিলাভের জন্য ইসলাম এক গুচ্ছ অমোঘ আইন ও নীতির প্রতি দ্বিধাহীন ও সশ্রদ্ধ আনুগত্য দাবী করে। এগুলো ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়কে সুন্দরভাবে পরিচালিত করে। এ আইন নবীদের মাধ্যমে আগত ঐশী আইন। এজন্য এগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রদবদল করা সম্ভব নয়। মর্ডানিষ্টগণ সরবে বিপদ সংকেত দেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার আইন লংঘিত হচ্ছে। তাদের চোখে ভ্রান্তিতে ডুবে আছি আমরা মুসলমানরা। কারণ আমরা চরম সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি অথচ বিলাসী হবার ব্যাপারে এতটুকু যত্নবান হতে পরিনি। বস্তুত চরম সত্য বলে কিছু একটা আছে বলে তারা স্বীকার করে না। তারা বিলাসের মধ্যেই থাকতে চায়। এ বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা যাক।

আমেরিকার হাসপাতালগুলোর সমস্ত রোগীর অর্ধেকই মানসিক ব্যধিগ্রস্ত। একটা বিশেষ উদাহরণ দেয়া যাক। নিউইয়র্ক স্টেটকে তার বার্ষিক বাজেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী ব্যয় করতে হয় শুধু মানসিক ব্যাধির হাসপাতালগুলো চালাবার জন্য এবং রোগীদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

www.amarboi.org

পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশে আত্মহত্যাই মৃত্যুর প্রধান কারণ। তাদের সভ্যতার উপহার যদি এই হয়, তবে এক বিপুল পরিমাণ ক্ষতি ও দুঃখ-ক্লেশ রয়ে গেছে তাদের এ পার্থিব স্বর্গে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রারম্ভ থেকে গত পাঁচটি শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বড় দম্ভোক্তি হচ্ছে এর তথাকথিত উদার শিক্ষানীতি (Liberal Education) তাদের ভাষ্য ঃ ইসলামী শিক্ষা অর্থই হচ্ছে আরবী ভাষায় পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করা। না বুঝে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা। এজন্য তা ব্যক্তির সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভার (Creative intellectual faculties) উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ফলে এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্ম দেয় গোঁড়ামী (Dogmatism) ও সংকীর্ণতার। এরপর তারা সুনিশ্চিত করে বলেন, অজ্ঞেয়বাদী বিবর্তনমূলক মানবতাবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাই (Education based upon agnostic evolutionary humanism) হচ্ছে সঠিক শিক্ষা। এ শিক্ষা উদারতার প্রতি ব্যক্তির নম্র অনুসন্ধিৎসার শ্রীবৃদ্ধি করে এবং তার মধ্যে সবরকমের অকৃত্রিম (Ronest) মতপার্থক্যে পূর্ণ সহনশীল এক প্রশস্ত মনের প্রতিষ্ঠা করে।

এসব তাদের প্রচারণা। কিন্তু আসল তথ্যগুলো কি ? ইংরেজদের উদারনৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো (Liberal arts school) এক শতাব্দীর বেশী সময় ধরে পাক-ভারত উপমহাদেশে তার একচ্ছত্র প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। এতে পাক-ভারতীয় স্কুল-কলেজগুলো কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র (Vocational training factories) ছাড়া উত্তম কিছুই হয়নি। সত্যিকার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পার্থিব প্রগতির পূজা করার জন্য যারা জড়ো হয়, তাদের মধ্যে অধ্যয়নে কিছুটা যত্নবান ছাত্র থাকলেও যথেষ্ট অনুরাগী ছাত্র নেই বললেই চলে। তাদের একমাত্র উদ্বেগ হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা এবং তুচ্ছ চাকুরীতে (White-collar job) নিয়োগ লাভের জন্য ডিপ্লোমা কিংবা সার্টিফিকেট অর্জন করা নিয়ে। শিক্ষকগণও শিক্ষাদানে বিশেষ যত্ন নেন না। ছাত্রকল্যাণে তাদের কোনো চিন্তাই নেই। তারা শুধু নিজ নিজ বেতনের প্রত্যাশী। পরীক্ষায় প্রতারণা করার অসংখ্য জঘন্য উপায় ছাড়াও যদি কোনো ছাত্র-ছাত্রীর এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদের বাপ-মা তাদেরকে পাশ নম্বর দেয়ার জন্য শিক্ষককে ঘুষ দেয়। পাক-ভারতীয় স্বাধীনতার পর দু'দশক ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দান, এ শিক্ষাব্যবস্থার জীর্ণতার সীমা নেই। বড়জোর এটা প্রচুর সংখ্যক আমলা, প্রযুক্তিক আমলা (Technocrats), যান্ত্রিক মানুষ (Automan) তৈরী করতে পারে, কিন্তু

www.amarboi.org

কখনই প্রকৃত মানুষ তৈরী করতে পারে না। এশিয়া-আফ্রিকায় বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষারত হাজার হাজার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যয় এক ডজন পণ্ডিতেরও নাম করা যায় না। কৃত্রিম মূল্যবোধ (Shoddy Values) আর ভাসা ভাসা চিন্তাই এদের মূলনীতি। 'পূত-পবিত্র ও ঐতিহ্যবাহী' সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই এদের বৈশিষ্ট্য। এদের মানসিক অস্থিরতা ও আবেগগত আলোড়নের (Emotional Turmoil) পরিণতি হচ্ছে উচ্চহারে আত্মহত্যা আর অপরাধমূলক কার্যকলাপ (Criminal Acts)। এসব ছাত্রের কাউকে প্রশ্ন করলে তার মধ্যে সেই বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা, 'সেই' সৃষ্টিক্ষম মৌলিক (Original) ও স্বাধীন মন এবং বিনম্র সত্যানুসন্ধিৎসার নামগন্ধও পাওয়া যাবে না। অথচ আমাদের নেতারা মনে করেন, এগুলোই পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ।

প্রাচীন রোমে এক বস্তুবাদী সভ্যতা প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার অনুসারীরা সিনিক (Cynic) নামে পরিচিত। তারা বাগ্মীতা শিক্ষার কতগুলো বিশেষজ্ঞ স্কুল পরিচালনা করতেন। এগুলোতে ছাত্ররা সকালে এক বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সতর্কভাবে যুক্তিতর্ক করত, বিকেলে সমর্থন করত তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো বিষয়কে এবং ডিগ্রি লাভের (Graduation) পর সমর্থন করত এমন কোনো মতকে যা সেই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এভাবে সিনিক দার্শনিক নির্মাণ করতেন রোমের বুদ্ধিমান লোকদেরকে। এ বুদ্ধিজীবীদের থাকতো না কোনো নিজস্ব মূলনীতি, মূল্যবোধ বা অকপট দৃঢ় প্রত্যয়। আজকের ছাত্রদের অবস্থান সেই দু'হাজার বছর আগের সিনিকদের অবস্থার অনুরূপ বলা চলে।

জড়বাদী নীতি (Materialistic Dogma) যা সমকালীন বিশ্বকে তার ভয়াল মুঠোয় দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে, তা হচ্ছে মার্কসবাদী, অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা (Concept of Economic Man) কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী ও অনুসারীদের মতে, মানুষের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দর্শন ও বিজ্ঞান নির্ধারিত হয় প্রচলিত নৈতিক কাঠামো দ্বারা এবং শুধু অর্থনৈতিক জীবিকার প্রকৃতির পরিবর্তন হলেই আসবে আদর্শ, মূল্যবোধ ও নীতির অনুরূপ পরিবর্তন। অন্যকথায় অ-বস্তুগত (Non-material) সব বিষয়ই নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর। তাই উৎপাদনের পদ্ধতি বদলে গেলে এর সাথে জড়িত সংস্কৃতির নৈতিক ভিত্তিরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ তাদের যুক্তি শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তেই পৌছে যে, ঐশী ধর্ম ও অমোঘ নীতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। মানবকল্যাণ এবং অর্থনৈতিক প্রগতি সমার্থক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির অর্থও বৈষয়িক কর্মে উন্নতি। আধুনিক সরকারের

www.amarboi.org

প্রধান উদ্দেশ্য আইন-শৃংখলাকে তার আয়ত্বে রাখা কিংবা নাগরিকদের বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা নয়। এ সরকারের ধারণা এগুলো কেবল অন্ধকার মধ্যযুগের সেকেলে সংস্কার (Notion)। আজকাল সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো, যাতে সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিবেচনা (Consideration) অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যয়িত হয়, তা সুনিশ্চিত করা। ফলতঃ যোগ্যতা থাক বা না থাক সবাই যেনো দ্রুত "জীবন যাত্রার মান" উন্নয়ন করতে সমর্থ হয়। আর সে জীবন যাত্রার মান পরিমাপ করা হয় সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ দ্বারা। তাই আজ প্রতিটি দেশের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে জন্মহার, মৃত্যুহার, আয়ুর গড়, মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু তাপ ও প্রাণীজ প্রোটিন ব্যবহার শত-সহস্রে বা মিলিয়নে রেডিও, টিভি, সেট ও ব্যক্তিগত গাড়ীর সংখ্যা প্রভৃতির সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান সংকলন করা। এ মাপকাঠিতে যেসব দেশ ওপরের সারিতে স্থান পায়, তাদেরকে বলা হয় অগ্রসর, আর যেসব দেশ এ দৃষ্টিকোণ থেকে নীচের সারিতে স্থান পায় তাদেরকে বলা হয় অনগ্রসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই অনগ্রসর দেশগুলো অনগ্রসর এর স্থলে অনুন্নত (Under Devloped) হয়ে যায়। অতি সম্প্রতি এ দেশগুলোকে আর অপ্রীতিকর অনুন্নত না বলে শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগ করে বলা হয় উন্নয়নশীল বিশ্ব (The Developing World)।

আজকাল মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পরিসংখ্যান জরিপ (Statistical Survys) ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রাবল্যে মানবিক বিবেচনা বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। আজকাল ব্যক্তিকে বেঁচে থাকতে হয় নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য। সে যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাস। এ অবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ ও মহত্ব সবই অর্থহীন হয়ে গেছে। তাই আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতি যথার্থ শিক্ষাকে মূল্য দেয় না। কারণ শিক্ষা ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করে এবং গড়ে তোলে আদর্শ চরিত্রবান রূপে। এর ফলে সে ভালমন্দ বুঝতে পারে, সত্য-অসত্য ও সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষাকে আজকালকার রাষ্ট্রনীতি-নির্ধারকরা এক বিশেষ অর্থে অপরিহার্য মনে করে এবং তা হচ্ছে সার্বজনীন অক্ষরজ্ঞান (সংকীর্ণতম দৃষ্টিকোণ থেকে ধরে নিলে) এবং প্রযুক্তিক প্রশিক্ষণ। কারণ অক্ষরজ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অনগ্রসর নাগরিকদেরকে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে সবদিক থেকে সচেতন করে তুলবে এবং সচেতন নাগরিকে পরিণত করবে, তাকে তারা ভয় পায়। আজ অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগ উচ্ছেদের জন্য যে ব্যাপক প্রচারাভিযান

www.amarboi.org

চলছে, তার পেছনে রোগীদের প্রতি সহানুভূতি বা দুঃখী মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করার কোনো কামনা নেই। এর পেছনে কোনো মানবিক দায়িত্ববোধ নেই। এর উদ্দেশ্য শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে নিষ্কন্টক করা। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের (Experts) দৃষ্টিতে জনস্বাস্থ্য কল-কারখানার স্থুল জাতীয় উৎপাদন (G. D. P) বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। রুগ্ন পীড়িত জনগণ উন্নয়নের অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় উদ্যম ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা আমেরিকার মত অগ্রসর দেশের মাথাপিছু আয়ের সমান আয় করতে অক্ষম। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ সামনে রেখে জনস্বাস্থ্যের কথা ভাবা হচ্ছে, নিঃস্বার্থ মানবিক মূল্যবোধের কথা ভাবা হচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল ও রুগ্ন লোকদেরকে যতদূর সম্ভব এক সাধারণ জীবন যাপন করতে ও লাভজনক কর্মে নিয়োগের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে সমর্থ করে তোলার জন্য তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে প্রশংসনীয় কাজ করা হয়, তাও তার নৈতিক মান হারিয়ে ফেলে। তার পেছনে অসহায় পরনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে তাদের আর্থিক ভরণ-পোষণের বোঝা মুক্ত করার চেষ্টা যতোটা, দুঃখী মানুষ হিসেবে তাদের দুঃখ দারিদ্রকে মোচনের সদিচ্ছা ততোটা নেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনও ঐ একই নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ (Economic Experts) ঘোষণা দিচ্ছেন—জনসংখ্যা খাদ্য দ্রব্যের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য নির্দোষ, অসহায়, অরক্ষিত শিশুরাই হচ্ছে এখন বলির পাঁঠা (Scape Goat)।

এদেরকে বলা হয় 'এক নম্বর জাতীয় শত্রু'। জনবহুল এ বিশ্বে ইতিমধ্যেই অনেক বেশী শিশুর জন্ম হয়েছে। তাই আজ প্রতিটি শিশু শুধু খাবার জন্যই অশুভ মুখ নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। যদি ক্রমশঃ জনসংখ্যা আরো বেড়ে যায় তাহলে যে দ্রব্যসামগ্রী আছে তা দিয়ে সকলের চাহিদা মিটবে না, আর্থিক উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং সবাইকে উপোশ করে মরতে হবে। তাই প্রতিটি নবজাতক অর্থই অতিরিক্ত ঝামেলা (Additional Dependent)। শুধু তাই নয়, নবজাতকরা দেশের আয়ের উৎসের ওপর অতিরিক্ত বোঝা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে আর এক বাধা। অন্যান্য সবকিছু সহ যৌন ক্ষুধাকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপযোগী হতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের এহেন অবমাননার চেয়ে অপমানকর আর কি হতে পারে?

পাশ্চাত্যের "অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ" (Economic Experts) বলেন, এশীয় দেশগুলো অনগ্রসর। কারণ তারা শতাব্দী ধরে সাংস্কৃতিক নিশ্চয়তায় সন্তুষ্ট থেকেছে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অংশ নিতে স্বেচ্ছায়

www.amarboi.org

অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নৈতিক দিকটি নির্দেশনা (Moral Guidance) ও আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের (Spiritual Sustenance) অতীতের বিজ্ঞদের শিক্ষায় নির্ভর করা তাদের মারাত্মক ভুল। তাদের সে শিক্ষা পরিবর্তন ও প্রগতি বিমুখ। এ বিশেষজ্ঞগণ কখনোই সচেতন হয়ে ভেবে দেখেননি যে, আধুনিক পাশ্চাত্যের আর বৈজ্ঞানিক প্রগতির ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মানবতাবাদী দর্শনের কাছে ঋণী। আর সে দর্শন যান্ত্রিক বিবর্তনমূলক প্রগতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের বৈষয়িক সমৃদ্ধিকেই (Material Progress) সর্বপ্রধান বিবেচনা করেছে এবং বাতিল করে দিয়েছে সমস্ত ধর্মীয় মূল্যবোধকে।

এশিয়া পশ্চাৎপদ ভূখণ্ড। এরূপই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। কারণ সে দিনের বেলায় তন্দ্রা থেকে উঠতে এতো বেশী দেরী করেছে যে, এর মধ্যেই পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলো তাকে কয়েক শতাব্দী পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। মোটকথা পশ্চাৎপদ এশিয়াকে এখন পাশ্চাত্যের নাগাল পাওয়ার জন্য সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এ বিশেষজ্ঞগণ সবসময়ই নিশ্চয়তা দিয়ে আসছেন যে, বেশী বেশী দুঃখীবাদী হওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজকাল শিক্ষা প্রণালী, এবং প্রাযুক্তিক ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সমস্ত 'অনগ্রসর' দেশকে তার উন্নতির ক্রিয়াকৌশল অত্যন্ত বেশী সদিচ্ছার সাথে দান করবে।

ফলত হাড়ভাংগা পরিশ্রম করে ইউরোপকে যা অর্জন করতে পাঁচ শতাব্দীর যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রাম করতে হয়েছে, এশিয়া আফ্রিকা তা মাত্র এক পুরুষের মধ্যে লাভ করতে পারবে। এ প্রচারনা আরো নিশ্চয়তা এনে দেয় যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ অনগ্রসর দেশগুলোর জন্য এক অবিমিশ্র আশীর্বাদ। কারণ এ পথে বিশ্বের জাতিগুলো পাশ্চাত্যের উন্নতি ও প্রাচুর্যের প্রত্যাশা সহজেই করতে পারবে। তাই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, শিল্প ও স্বাস্থ্য সহজ সাধ্য করার উপায় ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শাসনই নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে বলে তারা বলে বেড়াচ্ছে।

আজ নামেমাত্র স্বাধীন অনগ্রসর দেশগুলোর সাক্ষী গোপাল (Puppet) শাসকগণ নিজেরাই মোটা গলায় বলছেন যে, তাদের উচ্চাভিলাষী "পাঁচসালা পরিকল্পনার" ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে সেকেলে আদর্শ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক জনগণের ঔদাসীন্য, শৈথিল্য ও ঐতিহ্যবাদ।

১৯৬৭ সালে একদল স্বতন্ত্র অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী নিইউয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হন। সেখানে তাদেরকে নিম্ন লিখিত দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় ঃ

"জাতিসংঘ উন্নয়ন দশক" (UNDD) প্রকৃতপক্ষে কোনো উন্নয়ন সাধন না করেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ সংকটাবস্থায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর

www.amarboi.org

ক্রমবর্ধিত মেরু প্রবণতার (Increasing Polarisation) ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকারমূলক কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ? উন্নত জাতিগুলোর কাজ কি এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দায়িত্বই বা কি ?"

আমেরিকার আন্তরিক বন্ধু চার্লস মালিক নামে লেবাননের এক খৃস্টান-আরব সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। এক উচ্চকণ্ঠ জবাবে তিনি বলেন ঃ

"আমরা এখানে এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যেগুলো অর্থনৈতিক যে কোনো বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আলোচনা করছি ইতিহাসের সমগ্র সঞ্চিত সম্পদ সম্পর্কে। এ সম্পদ কাজে লাগিয়ে কতগুলো জাতি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্যে সফলকাম রূপে প্রবেশ করেছে, আর অন্যেরা করেনি। তাই রাশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশগুলোকে সভ্য করার জন্য দায়ী—এ সরল সত্যটি এড়ানোর যো নেই, কারণ রাশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে, পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান ও চিন্তার তাৎপর্য। তাই 'ধনী' ও 'দরিদ্র' জাতির ব্যাবধান দূর করতে হলে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রচলিত পদ্ধতি অনেকটা যৌগিকভাবে পুনর্বিবেচনা করতে হবে, যাতে করে দরিদ্র জাতিগুলোকে চিরস্থায়ীভাবে তাদের ছত্রছায়ায় নেয়া যায়। সেজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও ভাবোদ্দীপক পুনর্বিন্যাস।

Colambia Journal of World Business" (Colambia University, New York, 1967 থেকে উদ্ধৃত—এটি পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধির জন্য United States Information Service-এর মাসিক সরকারী পত্রিকা Panorama-তে পুনঃ প্রকাশিত হয় Panorama, Karachi, February, 1968, p.p.27-28

আগ্রহের সাথে দাসত্ব বরণ করে নেয়া হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার 'দায়িত্ব'। এ দায়িত্ব যাতে তারা সুষ্ঠভাবে পালন করে সে জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সেগুলো পাশ্চাত্যের সুসমাচার এমনভাবে শিক্ষা দিচ্ছে, যাতে তা এক ধরনের সম্মোহনী প্রভাব সৃষ্টি করে আফ্রো-এশিয়দের মনে। উপরন্তু আফ্রো-এশীয়দের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি সেকেলে ও মূল্যহীন হয়ে যায় এবং পরিশেষে পাশ্চাত্য সভ্যতা

www.amarboi.org

অজেয় ও অবিনশ্বর বলে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সাংস্কৃতিক দাসত্বকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব দিয়ে দৃঢ়বদ্ধ করে নেয়া প্রয়োজন। আর সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন'কে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তাহলে দেখা যাক প্রগতির পক্ষে এই সুসমাচারের পরিণাম কি ?

ইউরোপ-আমেরিকায় ইহুদীবাদী প্রচারণা ফিলিস্তিনে পাশ্চাত্যের ইহুদীদের উপনিবেশ স্থাপন ন্যায়সংগত বলে প্রমাণ করেছে এবং এর সাথে আরবদেরকে আধুনিক সভ্যতায় আশীর্বাদপুষ্ট করার দাবীও করেছে। ফিলিস্তিনী আরবরা এ আশীর্বাদ তথা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মারণাস্ত্রের মতো আধুনিক আশীর্বাদের সাথে সত্যিই আজ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাদের দেশে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড উৎপীড়ন চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি, নির্বাসন প্রভৃতি করা হচ্ছে প্রগতির নামে। অথচ ইহুদীদেরকে নিন্দার একটি শব্দও পশ্চিম থেকে শোনা যায় না। বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেনো, ইহুদীবাদী প্রচারণা একথাই নিশ্চিত করে দিচ্ছে 'ইসরাঈল' কি পশ্চিম এশিয়ার বাকী দেশগুলোর কাছে অজ্ঞাত এমন এক বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চতায় ওঠেনি ? কখনো ভুলবেন না তারা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়—যখন ফিলিস্তিন আরবদের কাছে ছিলো তখন সেটি কি এক নিরীহ ও অনগ্রসর দেশ ছিলো না ? ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের তার নিজস্ব ক্ষুদ্র সংস্কার মিশন (Miniature Civilising Mission) পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। তার পুতুল প্রজাতন্ত্রী সরকার ঘোষণা দেয় যে, আধুনিক সভ্যতার যে সমস্ত আশীর্বাদ থেকে ইমামের (Imam) শাসন প্রণালী তাদেরকে বঞ্চিত রেখেছে, নাসের তা শীঘ্রই এনে দিচ্ছেন। এ নাসেরের হাতে নাকি ইয়েমেনীদের জন্য এগিয়ে আসছিল সমৃদ্ধির এক গৌরবময় যুগ। ইয়েমেনীরা শীঘ্রই বুঝতে পারে নাসেরের আধুনিক আশীর্বাদ—উৎপড়ীনের আশীর্বাদ, বোমাবর্ষণে গ্রাম খামারের ধ্বংস সাধন আর বিষাক্ত গ্যাসে নির্দোষ সাধারণ মানুষের নির্মম হত্যাকাণ্ডের আশীর্বাদ। পাশ্চাত্য জগত তখন এরূপ নৃশংসতায় কিছুমাত্রও বিচলিত হয়নি। কারণ ইয়েমেন কি তখনও সবচেয়ে বেশী সেকেলেও অনগ্রসর ছিলো না ?

ভিয়েতনামে আমেরিকার পরিতোষিক শিক্ষা মিশনের (Prize Civilizing Mission) কথা সমগ্র বিশ্বই জানে। এ উদ্দেশ্যে ভিয়েতনামে একটি সত্যিকার অর্থে মুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে দেয়ার জন্য আমেরিকা প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু যখন ওয়াশিংটনে পদস্থ কর্মকর্তাগণ (Officials) ভিয়েতনামের 'অনগ্রসরতা' শোচনীয় জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন দেন, তখন ভিয়েতনামে চল্লিশ লক্ষ লোক নিহত হয়। দ্বিতীয়

www.amarboi.org

বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে বর্ষিত বোমার চেয়েও বেশী আমেরিকার বোমা বর্ষণ করা হয় সেই ক্ষুদ্র দেশটির ওপর। আর তাও যথেষ্ট মনে না হওয়াতে শুধু ভূখণ্ডের বনভূমিগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ছুঁড়ে দেয়া হয় হারবিসাইড (Herbisides) নামক বিষাক্ত গ্যাস। এ গ্যাস উর্বর ভূমিকে পরিণত করে সম্ভবত শতাব্দী ধরে চাষের অযোগ্য শুষ্ক মরুভূমিতে ওসব এলাকার জনগণ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর সবকিছুই ঘটে জংগলের মুষ্টিমেয় ভিয়েত কংকে বঞ্চিত করে আমেরিকার মূল্যবান সৈন্যদের জীবন বাঁচানের জন্য। কিন্তু যাই বলিনা কেন, সুসভ্য ? আমেরিকানদের কাছে অনগ্রসর এশিয়ার ভিয়েত কংরা (Viet Congs) হচ্ছে বর্বর কমিউনিষ্ট এবং তাদের জীবন সস্তা ও তাৎপর্যহীন।

এখন দেখা যাক, অপাশ্চাত্য জগতের অনগ্রসরতার কারণ কি ?

পাক-ভারত উপমহাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এলাকা। অনধিক চার শতক আগে মোঘল শাসনাধীন ভারতের সম্পদ ও উন্নতি ছিলো ইউরোপে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠাই ছিলো ইউরোপীয়দের মনোবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন ভারতে আসার নতুন পক্ষ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায়। সমগ্র বিশাল মহাদেশ যে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলো, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ইউরোপীয় বনিকগণ যদি শুধু ভারতে আসার জন্য এতো আগ্রহভরে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। তাহলে এটা অবশ্যই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিলো। মাত্র কয়েক শতক আগে এ জাতির সাধারণ অর্থনৈতিক প্রগতি ও জীবন যাত্রার মান ছিলো ইউরোপের যে কোনো কিছুর চেয়ে উর্দ্ধতর। শিল্প-বাণিজ্য ছিলো সমৃদ্ধ আর মোগল শাসনাধীন ভারত ছিলো বৈষয়িক প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির এক অনুকরণীয় আদর্শ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা মিশন (Civilising Mission) ভারতবর্ষকে কি দিতে পেরেছে ? একে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর। আর সে কোম্পানী বৃটেনের শিল্প বাণিজ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম এমন সব শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিটি পদক্ষেপ ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ, ফরাশী বা ইতালীয় যাই হোক—এক প্রকার বাণিজ্যিক অর্থব্যবস্থার (Mercantile Economey) সৃষ্টি করে। এর ফলে অধীন ভূ-খণ্ডগুলো উচ্চমানে শিল্পায়িত মূলদেশের (Mother Country) কাঁচামালের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। অথচ এ অধীন দেশগুলোকে সেই তৈরী দ্রব্য পুনরায় উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। এ বাণিজ্যিক অর্থব্যবস্থা ছিলো উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত

www.amarboi.org

নীতি। এ নীতি আজও ইসরাইলের বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার (Commercial Venture) দ্বারা আফ্রিকা বিশ্বস্তভাবে টিকে আছে। এ বাণিজ্যিক অর্থব্যবস্থা হচ্ছে নির্লজ্জ শোষণের নামান্তর। এটা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আনার নিশ্চিত ব্যবস্থাপত্র। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আঠার শতক পর্যন্ত আমেরিকায়ও এ অর্থব্যবস্থা চালু রাখে। তাই এ সময় আমেরিকায়ও কোনো শিল্পায়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি। একথাটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রেট বৃটেনের পক্ষে এটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। ছিলো এক সুচিন্তিত নীতি যাকে এরূপ ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হয় যে, আমেরিকার উপনিবেশে কোনো কলকারখানার যন্ত্রপাতি পাচার করাকে কঠোরতম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অন্য যে কোনো কারণের চেয়ে এই নির্মম অর্থনৈতিক নির্যাতন আমেরিকায় বিপ্লব ডেকে আনে। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, যদি আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধে বৃটেন জয়লাভ করতো, তবে আমেরিকাকে সম্ভবতঃ আজকের দিনের ইয়েমেনের মতো অনগ্রসর ও দরিদ্র অবস্থায় কাল কাটাতে হতো।

বেশ কিছু কাল হলো এশিয়া ও আফ্রিকা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। কেউ বলতে পারেন, তাদের অবস্থা উন্নতি হলো না কেনো ? ১৯৬০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিদল পরবর্তী দশককে 'উন্নয়ন দশক' বলে স্বাগত জানান। ধনী অগ্রসর জাতিগুলোর দায়িত্ব ছিলো অনগ্রসর এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাকে সাহায্য দেয়া। উন্নয়ন প্রকল্প সবরকমের প্রচারের মাধ্যমে শুরু হয় গভীরতম উৎসাহের সাথে। কিন্তু এখন সে দশক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ দুঃখের সাথে স্বীকার করেছেন যে, উন্নয়ন দশক শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতোসব আর্থিক ও প্রাযুক্তিক সাহায্য প্রকল্প সত্ত্বেও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ অনগ্রসর দেশগুলোর সম্পদকে অতিক্রম করে গেছে। ফলে ধনী ও গরীব জাতির মধ্যে ব্যবধান আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী। তাই অনগ্রসর জাতিগুলোকে সেকেলে ধারণা থেকে মুক্ত করে তাদেরকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদে আস্থাশীল করে তোলার অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ সমস্ত গণমাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিযান এবং শিক্ষাসূচীসহ বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনবোধে একনায়কত্বের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকরী করেন। পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিবর্গের এ সংগীতে জাপান, চীন ও রাশিয়া যোগ দিয়েছে। তাদের এ যোগদানকে পুঁজি করে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের ডাকে সাড়া দিতে আহ্বান জানাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা গরীব দেশগুলোর জন্য আগ্রহভরে তাদের শক্তি বিলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবুও ধনী দেশগুলো আরো ধনী হয়ে যাচ্ছে আর গরীব দেশগুলো হচ্ছে আরো গরীব। কেন ?

www.amarboi.org

শোষণ ও অবিচারের পরিণাম দারিদ্র

এ দারিদ্রের বিলুপ্তি কেবল তখনই হতে পারে যখন মানব প্রকৃতির সহজাত লোভ, লালসা ও স্বার্থপরতার উৎস সমূলে উৎপাটিত হবে। পরকালে আল্লাহর বিচার অগ্রাহ্য করা এবং ইহজগতের প্রতি অতিরিক্ত প্রেম এ অপলিপ্সা-অপকর্মের কারণ। তাই বিলাস ব্যাসন প্রিয় নাস্তিক্যবাদীরা সুযোগ পেলেই দুর্বলকে শোষণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। আল্লাহর বিচারে তার ভয় নেই, সে অধিকার সংরক্ষণে অজ্ঞ-অক্ষম ব্যক্তিদের মাথায় কাঁঠাল ভেংগে তার পার্থিব কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য বিনা দ্বিধায় সবরকমের সুযোগ সুবিধা নেবে। এটা ব্যক্তির ব্যাপারে যেমন সত্য, জাতির বেলায়ও তেমনই সত্য। বিশ্বে আমেরিকার জীবনমান সর্বোচ্চ কেন ? আমেরিকার প্রচার-বিভাগ দরিদ্র জাতিগুলোর 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে' তার সহানুভূতি ও বিস্ময়কর উদারতার প্রমাণস্বরূপ বাণিজ্যিক বিনিয়োগ, প্রাযুক্তিক ও বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদির বিজ্ঞাপন ছড়াচ্ছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শতকরা ছয় ভাগেরও কম জনসংখ্যার জন্য পৃথিবীর মোট প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন ব্যয় করছে। ১৯৬১ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত "দি ওয়েষ্ট মেকার্স" (The Waste Makers) বইয়ে ভ্যানস প্যাকার্ড (Vance Pacard) এ তথ্য পরিবেশন করেন।

যতদিন পর্যন্ত এ বিশেষজ্ঞগণ তথা কথিত অর্থনৈতিক সমস্যা একটি নৈতিক সমস্যা, একথাটি সত্য হিসেবে গ্রহণ না করবেন, ততদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সব ধরনের প্রগতি সত্ত্বেও দারিদ্র তীব্রতর হতে থাকবে। একমাত্র নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই পরিবর্তনের সম্পদের দুসম-বন্টন নৈতিক পরিবর্তন ভোগবিলাসপ্রিয় নাস্তিকদের সম্ভব 'খোদাভীরু মানুষে পরিণত করবে'। এ পথই কেবল মানুষকে লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখতে পারে এবং সবলকে বিরত রাখতে পারে দুর্বলের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ থেকে। সামাজিক ন্যায় বিচার হচ্ছে নৈতিক ন্যায় বিচার। সম্পদ সম-বন্টনের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ধরলেও মার্কসবাদ কখনো ন্যায় বিচার অর্জন করতে সক্ষম হবে না। কারণ এটা নীতির প্রশ্নে ঐশীপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিকতার অস্তিত্বকেই বাদ দিয়েছে। উৎপীড়ন হিংস্রতা ও হিংসার অনিবার্যতায় বিশ্বাসী একটি কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা এমনকি বৈষয়িক উন্নতির জন্যও অপরিহার্য ন্যায় বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনের আশা কিভাবে করতে পারে ?

www.amarboi.org

যুগ যুগ ধরে পাশ্চাত্যের নেতারা বিশ্বের মানুষকে বলে আসছেন যে, মুসিলম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আজ যে অনগ্রসরতা বিরাজ করছে তার জন্য দায়ী ইসলাম। অথচ কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইতিহাসের পাঠক একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব ছিলো ততদিন পর্যন্ত তাদের শাসনাধীন জনগণ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছিলো। আট থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে ছিলো 'দার-উল-ইসলাম'। আমাদের অর্থনৈতিক অবক্ষায় দেখা দেয় আধ্যাত্মিক অধপতনের শুরুতে এবং বিদেশীয় আধিপত্য স্বীকার করে নেয়ার সাথে সাথেই তা অতলগর্ভে ডুবে যায়।

আজকাল আমরা 'নামে মাত্র রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের দাবীদার। অর্থনৈতিকভাবে আমরা অতীতের চেয়ে আরো বেশী দাসত্ব স্বীকার করছি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানই এক অনন্য উদাহরণ। ঘোষিত স্বাধীনতার দু'দশক অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ, আমেরিকা ও বর্তমানে চীনের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্য-সামগ্রী ও সামরিক অস্ত্রপাতি আমদানির ওপর নির্ভর করে আসছে পাকিস্তান। এর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিই দেশী নয়। কল-কারখানাগুলোর প্রায় সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত। দেশে তৈরি দ্রব্যের বাণিজ্যিক নাম সবই ইংরেজী নাম। বিদেশী বাণিজ্যিক বিনিয়োগ সংস্থাসমূহ নিশ্চিত করে নিচ্ছে যে, আমাদের শিল্পায়নকে আমাদের নয়, তাদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। কেবল পনের বছর আগে যে পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করেছিলো, বর্তমানে সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে আমেরিকার উদ্বৃত্ত গমের ওপর। যদি খাদ্যসামগ্রী আমদানি বন্ধ হয়, তবে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত হবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে। আর একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ হলো মিসর। প্রেসিডেন্ট নাসেরের দ্বারা রাশিয়ার উপকারার্থে এক বিশাল তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তুলা-উৎপাদন হচ্ছে মিসরের অর্থনীতির ভিত্তি। আর নাসের তার সমস্তটাই বিক্রি করে দিয়েছেন রাশিয়ার কাছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন মিসরে অভাব-অনটন আজ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা কি কোনো রহস্য ? মাত্র দু'দশকের মধ্যে চীন এক–অন্নকষ্ট ক্লিষ্ট দেশ থেকে এক বিশ্বশক্তিতে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আর একই সময়ে কেন পাক-ভারত উপমহাদেশ দারিদ্রে ডুবে গেছে ? আফ্রো-এশীয় দেশগুলো চীনের প্রশংসা করেছে এর কারণ এটা নয় যে, তাতে কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্র আছে। বরং এর কারণ হচ্ছে, চীন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেই একমাত্র অ-ইউরোপীয় শক্তি যে সম্পূর্ণরূপে সব

www.amarboi.org

স্বকীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তার দৃশ্যমান প্রগতি অর্জন করেছে। যদিও চীন আদর্শিকভাবে মার্কসবাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতির দাস, তবুও সেই একমাত্র অ-ইউরোপীয় দেশ, যে পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মাওলানা ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মত কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সাম্যবাদ অবলম্বনকে চীনের প্রগতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থাই পাকিস্তানের উন্নতির প্রশস্ত পথ। এ রাজনীতিকগণ একটি ভ্রান্ত ধারণার ওকালতি করছেন। যদি মার্কসবাদই অনগ্রসরতার সর্বরোগ প্রতিকারক ঔষধ হয়, তবে আলবেনিয়া ও মঙ্গোলিয়ার মত অটলনীতি দেশগুলোর দারিদ্র ও অত্যধিক অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণ কি ?

❐

www.amarboi.org

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র প্রশস্ত পথ

সার্বজনীনভাবে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিশ্বের জাতিগুলোর বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জনের একমাত্র উপায়। প্রাচ্য-অপ্রাচ্যের অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন মানুষকে ন্যায়-নিষ্ঠা, উদারতা অর্জন ও দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা এবং লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকার কথা বললেও তাদের কোনোটিই এসব গুণ বাস্তবায়নের এমন কোনো উপায় নির্দেশ করতে পারেনি যা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বারবার আল্লাহর প্রার্থনা করা ও গরীবের পাওনা পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে সবসময়ই সালাত কায়েমের, যাকাত দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা-যাকাত ছাড়া সালাত মূল্যহীন। ইসলাম যাকাত সমন্বিত এমন এক সামাজিক ন্যায় বিচারের শিক্ষা দিয়েছে, যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত আবুবকর রা. যাকাত দিতে নারাজ বিদ্রোহী আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন জিহাদ করে যান। এসব গোত্র ইসলামের অন্যান্য বিষয় মানতে রাজী থাকলেও হযরত আবু বকর রা. যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে স্বধর্মত্যাগী (Appostates) বলে চিহ্নিত করেন।

ধর্মপদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইসলাম অদ্বিতীয়। এর মৌলিক শিক্ষায়ই রয়েছে অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানের কথা। আজকের দিনে যাকাতের মূল্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা অত্যন্ত নিন্দামুখর। তারা এটাকে ভিক্ষুককে ভিক্ষাদানের বেশী কিছু মনে করেন না। তাদের কথা ভিক্ষাদান আধুনিক সমাজে কোনো কাজেই আসতে পারে না। তাদের দর্শন জীবনের নিছক বৈষয়িক বিষয়েই সীমাবদ্ধ। তারা বুঝতে পারেন না যে, যাকাতের মূল্য কেবল ধনী কর্তৃক নির্ধনকে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বস্তুতেই সীমিত নয়। এটা কেবল ব্যক্তির মোট উদ্বৃত্ত সম্পদের ২.৫% নয়, এটা এক প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিশুদ্ধি, যা গ্রহীতার চেয়ে দাতাকে লাভবান করে অনেক বেশী। ইসলামের শিক্ষা হলো, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের সব সম্পত্তির মালিক। তিনি সেগুলো মানুষকে আমানত (Trust) হিসেবে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় মানুষকে অবশ্যই এ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এ জন্য তাকে পরকালের কল্যাণলাভের জন্য ইহকালের ধন-সম্পদের সঞ্চয়ের কম মূল্য দিতে হবে। মানুষের আল্লাহভীতির প্রমাণ হলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য তার কষ্টার্জিত সম্পদের একাংশ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দান করা। তার প্রতি

www.amarboi.org

আল্লাহর নির্দেশ, সে যেন অতিরিক্ত সম্পদ গরীবের সাহায্যে ও অন্যান্য লোকহিতৈষী কাজে ব্যয় করে। সম্পদের একটা নির্দিষ্ট অংশ যাকাত। একজন খাঁটি মুসলমান যাকাতের সাথে সাথে সদকাও দিবেন। এসব দানে গ্রহীতাও অবমাননা অনুভব করে না। কারণ দাতা গ্রহীতার কাছ থেকে এর পরিবর্তে শ্রদ্ধা বা অন্য কিছু আশা করে না। সে তার পুরস্কার প্রত্যাশা করে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে। সে গ্রহীতার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হয়। কারণ এ দান গ্রহণ করে সে তাকে আল্লাহর নির্দেশ পালনে সহায়তা করেছে। দাতব্য কাজে যারা অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে আল্লাহ্ প্রতিনিয়ত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, দান-গ্রহীতা নয়, তিনি স্বয়ং তাদেরকে (দাতাদেরকে) ইহলোক ও পরলোকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। এরূপে যাকাত দুর্বল অসহায়দের জন্য সহানুভূতি, উদারতা ও মহত্ত অর্জন করতে সহায়তা করে। এ গুণাবলী সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হলে এবং প্রত্যেকের মধ্যে ধনীদেরকে কল্যাণের দায়িত্ববোধ জাগলে চরম দারিদ্র আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

ইসলামী আইন যে কোনো হারে সুদ দান বা গ্রহণ মদ্যপান বা উত্তেজনাকর পানীয় এবং লুটতরাজ প্রভৃতি অবৈধ ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। এ আইন বিলাস-বহুল ও অমিতব্যয়ী জীবন যাত্রার নিন্দা করে। কুরআনী বিচার বিধান অল্প ক'জনের হাতে সম্পদ সীমিত রাখতে দেয় না। প্রাপ্য সম্পদের সঠিক বন্টনে সহায়তা করে।

ইসলামের সমালোচকরা আমাদের ঈমানকে পশ্চাদমুখী অনাধুনিক বলে নিন্দা করেন। আমাদের ইহকাল বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করাই যেনো তাদের কাজ। যারা আজ ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চান (অর্থাৎ যারা পবিত্র শরীয়তকে দেশের অলংঘ আইন/অমোঘ বিধান করতে চান) তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদের ঝড় তুলে বলেন, ইসলামী আইন মানুষকে এ আধুনিক জগত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মধ্যযুগের অন্ধকারে ঠেলে দেবে। সভ্যতার প্রগতির চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তাদের মতে যা কিছুই প্রাচীন বা ঐতিহ্যগত, তা অবশ্যই অনিবার্যরূপে বর্জনীয়। পূর্ববর্তী সে সব সংস্কৃতিই মূল্যহীন। সেগুলো সব ধরনের পরিবর্তন এবং উদ্ভাবনকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ বলে তার বিরোধিতা করছে। কেবলমাত্র ঐতিহ্যগত পবিত্রতার কারণে প্রতিটি প্রাচীন প্রথার পূজা করেছে। স্থায়ীত্ব বনাম পরিবর্তনের প্রশ্নে ইসলাম সমভাবে অসংগত পরিবর্তন এবং অবিমিশ্র রক্ষণশীলতা এ দু'টোরই পরিপন্থী। ইসলাম সর্বদাই মধ্যপথ অবলম্বন এবং চরম অবস্থা এড়ানোর পক্ষপাতী (ISLAM ALWAYS STRIVES TO TREAD THE MIDDLE PATH AND AVOID THE

www.amarboi.org

EXTRMES) নূতনতম জিনিস সর্বদাই সর্বোত্তম একথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এর বিপরীতটিও সত্য নয়। ইসলাম সমালোচনা বিহীন অতীত পূজার ঘোর বিরোধী। আল কুরআনে দেখতে পাই, মূর্তিপূজকদেরকে ইবরাহীম আ. বার বার যুক্তি প্রদর্শন করে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি পৌত্তলিকদের বলেছেন, "তোমরা কেনো এ মূর্তিগুলোর কাছে প্রার্থনা কর ? এগুলোর তো তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই ?" তারা উত্তরে বলেছিলো, "কারণ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।" তখন ইবরাহীম আ. বিস্মিত হয়ে বলেছেন, "তোমরাও কি তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো এ জাজ্জ্বল্যমান ভ্রান্তিতে ডুবে থাকবে ?" ইসলাম একটি অদ্বিতীয় জীবন পদ্ধতি। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এবং পুরাতন ও নতুনের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করেছে ইসলাম।

ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়া যুগোপযোগী সমস্যার সমাধান করার ও উদ্ভাবন অভিযান চালানোর জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছে ইসলাম। সে হিকমত (Scientific Knowledge) এবং 'ইজতিহাদ' (Scientific Investigation) অবলম্বন করতে বলেছে। তাই ইসলাম সত্যই একটি উত্তম ব্যবস্থা । কারণ এটা সঠিক এবং যথার্থ। কেবলমাত্র প্রাচীন বা নতুন হওয়া এর কোনো কারণ নয়। এর সত্যতা যাচাই হয় কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিন্তু তবুও পাশ্চাত্য তথা বস্তুবাদী জগত মনে হয় যেনো বিভীষিকায় চিৎকার করে বলছে, এটা মধ্যযুগীয় অন্ধকারবাদ (Medieval Obscurantism)। এ ভীতি ইসলামের পুনর্জাগরণের, নব জাগরণের। পাকিস্তানকে একটা ইসলামী রাষ্ট্র বলে সমালোচনা করতে গিয়ে আমেরিকার একজন বিজ্ঞ প্রাচ্যবাদী ডঃ ইউলফ্রেদ ক্যান্ট ওয়েল স্মিথ (Dr. Wilfred Cantwell Smith) তার জাতীয় ঐকমত্যের (Consensus) ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মুসলমানরা তাদের অতীতের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করে কি বোকামীটাই না করছে। তিনি বিশ শতকের একটি রাষ্ট্রকে সপ্তম শতকের আরবের মতো করতে চেষ্টা করার জন্য পাকিস্তানীদের ভর্ৎসনা করেন। তার ইংগিতে মনে হয় আমরা উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ী, রেলপথ বাদ দেবো এবং আরব মরুতে ফিরে গিয়ে পুনরায় উটের পিঠে চড়া শুরু করবো। এ ধারণার চেয়ে অপ্রাসঙ্গিক আর কি হতে পারে ? আমরা যা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছি তা হচ্ছে খোদা প্রদত্ত নৈতিক মূল্যবোধ এবং জীবনব্যবস্থা যা আমাদের ঐতিহ্যগত। এ প্রত্যয় পূরণের জন্য জীবনকে বাজী রাখার এবং মরণকে গ্রহণ করার সাহস আমাদের আছে।

www.amarboi.org

আমাদের সভ্যতার একটি বিবর্তনমূলক উন্নতি হওয়ার পথে কোনো আশংকা নেই। বিশ্বের যে কোনো জাতি উদ্ভাবন করেছে অথচ আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল প্রয়োজন, এমন যে কোনো নতুন জিনিসকেই আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করবো। আমাদের মূল্যবোধের ক্ষতিকর বা পরিপন্থী সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করবো। বিশ শতকের নিউইয়র্ক এবং পেরেক্লিসের এথেন্স সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবুও আধুনিক পাশ্চাত্যের সাথে সেকেলে পাশ্চাত্যের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধন (Continuity) ছিন্ন হয়নি। একই ভাবে আমাদের জাতি স্বভাবের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও প্রগতিকে আমরা স্বাগত জানাবো। পাশ্চাত্যকরণ থেকে এটা এক সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আমরা যে কোনো মূল্যেই আমাদের স্বাতন্ত্র এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। সংগতভাবে বলা যায় যে, আমাদের আদর্শ সমকালীন পাশ্চাত্যের আদর্শ থেকে পৃথক এবং সেহেতু আমাদের সমাজ সংগঠন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, পোশাক, খাদ্য, স্থাপত্য, শিল্প এবং রীতিনীতিও ঐ মূল্যবোধের বাস্তব অভিব্যক্তি (Tangible Expression) হিসেবে আমূল আলাদা হয়ে থাকবে।

নাযিল হওয়ার সময় থেকে পবিত্র কুরআন গবেষণা করে প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহকে আল্লাহর পরম ক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ বুঝার জন্য ঈমানদারগণকে অনবরত তাগিদ দিয়ে আসছে। পৃথিবীতে মানবজাতি আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ একথাও কুরআন বলেছে। আরো বিশদভাবে বলছে যে, বিশ্বের সমস্ত প্রাণী এবং উপাদান কেবল মানব কল্যাণের জন্যেই সৃষ্ট। তাহলে কুরআনকে কিভাবে বর্তমান মুসলমানদেরকে অনগ্রসরতা, অনড়তা ও অবক্ষয় (Decadence)-এর জন্য দায়ী করা যায় ?

পাঁচ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে (অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত) মুসলমানগণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বকে পরিচালনা করেছে—একথা ইসলামের কট্টর সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবে না। শূন্য (Zero) এবং তথাকথিত "আরবী সংখ্যার" (Arabic Numberals) উৎপত্তি হিন্দুভারতে এবং কাগজ মুদ্রাক্ষরকরণ ও গোলাবারুদ চীনের আবিষ্কার হলেও একমাত্র মুসলমানগণই এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারে মুসলমানরা গ্রীকদের জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে একটা প্রচলিত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা এই যে, তারা শুধু অতীতের জ্ঞানকে ধার এবং সংরক্ষণ করে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো এবং তাদের নিজস্ব কোনো অবদান রাখেনি। অথচ আর কেউই নয়, একমাত্র মুসলমানরাই আরবী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, তেজষ

www.amarboi.org

বিদ্যা (Pharmacy) এ চিকিৎসা শাস্ত্রের (Medicine) ভিত্তি স্থাপন করেন। আজ ওগুলো আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছে। ইউরোপীয়গণ কেবলমাত্র ওগুলোর উপরি কাঠামো (Superstructure) নির্মাণ করেন। ইউনানী চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত চিকিৎসা বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠ্যপুস্তক (The Standard Text Book) ছিল ইবনে সীনার কানুন (Canon)। মুসলমান সভ্যতার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববাসী হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও বিদ্যালয়কে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে জানতে পারেনি। এভাবে মুসলমানরা ভিত্তিস্থাপন করেছিল, যার উপর পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান। তাহলে প্রধান প্রশ্ন হলো, এরূপ জাঁকালো সূচনার পর কেন মুসলমানরা জ্ঞানের অনুসরণ ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেলো ?

যখন ঈমানকে আমরা কেবল আচারের সমষ্টি অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যে শুধু একটি ধর্ম বা আরাধনার বিষয় (Cult) রূপে বুঝতে শুরু করি, তখনই ইসলামী সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়। এ শোচনীয় ভুল ধারণার (Catastrophic Misconception) ফলে ইসলামী সভ্যতা তার গতিময়তা হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমশ অচল (Stagnat) ও মুমূর্ষ (Moribunal) হয়ে যায়। ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলো বিধর্মী পাশ্চাত্যের হাতে চলে যায়। আর মুসলিম বিশ্বের উৎকৃষ্ট প্রতিভাগুলো সুফিবাদ ও ধর্মতত্ত্বের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা থেকে তারা দূরে সরে যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ১২৫৮ সালে যে সময় মংগলীয় অভিযান (হালাকু খানের অভিযান) আব্বাসীয় খিলাফত উৎখাত করে বাগদাদ শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে, সে সময় ওলামাগণ শরীয়ত অনুযায়ী কাকের মাংস ভোজ্য কি না এ জ্বলন্ত প্রশ্নে এক অত্যন্ত বিতর্কে নিযুক্ত থাকেন। যখন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার প্রাধান্য স্বতঃ প্রমাণিত হয়ে গেলো, তখন ওলামাগণ নিজেদের প্রবঞ্চিত করার আরো এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন। ঘোষণা করলেন, মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্যের সভ্যতার বিরোধিতা করার উৎকৃষ্ট পথ হলো তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা ও দেখানো যে, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা ছিলো তাদের ভান। পাশ্চাত্য সভ্যতার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না করে ওলামাগণ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের (Schools & Sects) তুচ্ছতার উপর তুমুল তর্ক এবং শরীয়তপন্থীদেরকে মুসলমান না কাফের হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, এর ওপর বাকযুদ্ধ করেন। তাই বর্তমান শতকে কয়েকটি কৌতুহলী ওলামার দল কায়েদ-ই-আযম, আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে কাফের বলে রায় দিতে সাহস

www.amarboi.org

করেছেন। যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন সমগ্র উদীয়মান মুসলিম জাতিকে নাস্তিক ও বস্তুবাদীতে পরিণত করার ধমক দিচ্ছিলো, তখন ওলামাগণ দাড়ি ও সেলোয়ারের বাঞ্ছনীয় দৈর্ঘের ওপর ঝগড়া পসন্দ করলেন। আর যদি তার চেয়ে কেবল এক ইঞ্চিও কম হয় তবে নামায হবে না। যখন শরীয়তের অস্তিত্ব ও উদবর্তন (Survival) বিপন্ন ছিল, তখন এ ওলামাগণ একটি কূপে কোনো প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে গেলে তা পবিত্র করতে কত বালতি পানির প্রয়োজন, তার ওপর সেমিনার করতে ভালোবাসতেন। এরূপ আমাদের ওলামাগণ (অবশ্য এর মাত্রার ব্যতিক্রম আছে) সেই ফ্যারিসীদের (The Pharisess ইহুদী জাতির অন্তর্গত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়) মতো হয়েছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে ঈসা আ. (Jessus Christ)-কে তাঁর সমগ্র মিশন নিয়োগ করতে হয়েছিলো। মৌখিক সূক্ষ্মবিচারের চরম অবস্থায় কিছু সংখ্যক ওলামা তালমুদ (Talmud ইহুদীবাদের ব্যবস্থা ও পুরাণ সাহিত্য) অতিক্রম করে রাবিদেরকেও (হাদীসবেত্তা) লজ্জা দিয়েছিলেন। এসব সীমা লংঘন করা কার্যকলাপ আমাদের মিশনের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। ফলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে আমাদেরকে বির্জিত ও দাসে পরিণত করতে সমর্থ হয়।

মুসলিম মিল্লাতের সামনে ইসলামকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা, বা ব্যক্তিগত ধর্মপরায়ণতা হিসেবে তুলে ধরা উচিত হবে না। একে এক বিশ্বজনীন বিপ্লবী আন্দোলনরূপে পরিচিত করতে হবে। তাহলেই জড়বাদী পাশ্চাত্য শক্তিকে পরাস্ত করার প্রয়োজনীয় গতি ও শক্তি পুনরায় অর্জিত হবে। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আমাদের মতবাদ জোর করে আধুনিক বস্তুবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এর পূর্ণ ব্যাখ্যার (Re-interpretation) কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন এর ফলিত বাস্তবায়ন (Practical Implimentation), আর তা অর্জন করা সম্ভব হবে বলিষ্ঠ ও সঠিক নেতৃত্বে অধিক সংখ্যক মুসলমান এ কাজ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া মাত্রই। যদি এ নেতৃত্ব শিলাদৃঢ় সততা (Incorruptible Integrity) ও অটুট ঐক্য বজায় রাখতে পারে ও মিশনের সাফল্য অর্জনে যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, তবে ইসলামী আন্দোলন পাশ্চাত্যের মতবাদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে এবং তা করবেই। এর উচ্চ নৈতিক গুণাবলী এ আন্দোলনের কর্মীবাহিনীকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবে। চিন্তাশীল ও সংবেদনশীল পাশ্চাত্যবাসীরা তখন বুঝতে পারবে যে, তাদের জীবনব্যবস্থা কী নিরাশভাবে কলুষিত। শেষে তারা যোগদান করবে আমাদের সাথে।

www.amarboi.org

আমরা ধর্মীয় আধুনিকতার যে কোনো ধরনের বিরোধিতায় অবিচল। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবাদীগণ বিশেষ করে এইচ. এ. আর. গিব (H. A. R. Gibb) তার 'মর্ডাণ ট্রেণ্ডস ইন ইসলাম' (Modern Trends in Islam, Chicago 1945) গ্রন্থে ধর্মীয় আধুনিকতাবাদীর পক্ষ সমর্থনের যুক্তিতে (Modernist Appologetics) এর দুর্বলতাগুলো নির্দেশ করে আশ্চর্য হন। কেন এটা অবশ্যই এরূপ হবে ? আমরা বিশ্বাস করি যে, কোনো ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সাথে সংগতি পূর্ণ করতে চেষ্টা করার মধ্যেই পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদীদের দুর্বলতা নিহিত। সাধারণ মানুষ যদি (Mediocrity) বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা (Dishonesty) আধ্যাত্মিক অবজ্ঞা (Spiritual Blashphemy), নৈতিক কাপুরুষতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংশয়কে প্রশ্রয় দেন, তবে কেউ দ্বন্দ্বমান বা পরস্পর বিরোধী মতবাদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করতে পারে না—এটা সবাই বুঝতে পারে। যেহেতু মনুষ্য নামের যোগ্য কোনো ব্যক্তিই দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্তদের (The insipid and mediocre) প্রতি আকৃষ্ট হয় না, সেহেতু পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদ অবশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেবল যুগের খাম-খেয়াল অনুযায়ী সহজরূপে তৈরি ধর্মের প্রতি জনমানুষ আকৃষ্ট হয় না। জনগণ চায় চ্যালেঞ্জ। তারা যে আদর্শের অপেক্ষায় আছেন, যা তাদেরকে মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করবে। তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রমসাধ্য হিতকর (Worthwhile) কোনো কিছুর জন্য বেঁচে থাকতে বা মৃত্যুবরণ করতে চান। অল্প কথায় স্থায়ী মূল্যের কিছু অর্জন করতে চান। ঐশী ধর্ম-বিশ্বাস (Faith) ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামই বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব ও স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য সৃষ্টি করেত পারে। মানুষের তৈরি দর্শন কখনো এটা করতে পারেনি এবং পারবেও না।

যুগোপযোগী হওয়ার নিহিতার্থ এও হতে পারে যে, এ যুগের মানুষের কার্যাবলী এমন কতগুলো শক্তির জন্য দেয় যেগুলোর ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আর সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির আধুনিক প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট শক্তি আমাদেরকে অতি নীচ হয়ে অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য করে। এ জগতের উন্নতি করার অর্থ দাঁড়িয়েছে যে, উন্নতি করতে হলে নিজেকে একটা বাঁধাধরা বা মামুলী (Stereotyped) আদর্শে খাপ খাইয়ে নিতেই হবে। এর অর্থ হচ্ছে এটা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কিংবা ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যক্তিস্বার্থের অস্বীকৃতিস্বরূপ (Tantamount)। তাই ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেয়ার ফলে মানুষ হয়েছে যুগ প্রবাহের অনুগত দাস। এ

www.amarboi.org

যুগ প্রবাহের প্রতিকার কিংবা একে লঘু করার জন্য কিছু করতেও যে সমর্থ নয়। ধরা যাক, আমরা যদি সময়ের সমতালে চলতে গিয়ে পাশ্চাত্য বস্তুবাদ থেকে মানুষের প্রতিকৃতি (Image) ধার করে এনে তার সাদৃশ্যে নিজেদেরকে গঠন করি, তাহলে এর অর্থ হবে, যে নৈতিক অধঃপতনে পাশ্চাত্যবাসী আজ ডুবে আছে তার অভ্যন্তরে নিজেকে স্বেচ্ছায় পুষে রাখা।

১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী ও ৫ মার্চের মধ্যে জাতিসংঘ সমাজ উন্নয়ন কমিশনে ৩২টি দেশের প্রতিনিধি বিশ্বব্যাপী যুব সমস্যা সম্বন্ধে ৮০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত নেন। তাতে বলা হয়, সমাজবিরোধী আচরণ মানবজাতির উন্নয়নশীল সমাজের এক অবশ্যম্ভাবী ও অপরিবর্তনীয় পরিণাম। কারণ তাদের দেশের ধনৈশ্বর্য্য বেড়ে গেছে। এর অর্থ শুধু এ নয় যে, ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপকে দমন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না, বরং এ প্রবণতাগুলো আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে বাঞ্ছনীয়ও বটে। যৌন অনাচার ও কাম বিকৃতি (Sexual promiscuity and perversions) এবং গণমাধ্যমের গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা একইভাবে প্রশ্রয় দেয়া হয়। মনে হয় যেনো এ জাতিগুলো প্রায় বলতে চায় যে, সমাজে যে নৈতিক স্থিতি ও সামাজিক শান্তি আছে তাকে আধুনিক জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন না হওয়ার দরুন নিশ্চল ও 'অনগ্রসর' বলে নিন্দে করা উচিত।

আমরা দেখেছি যুগ প্রবাহ জীবনের যা কিছু পবিত্র ও উত্তম, তার সবটুকুই নিয়ে ছুটে চলছে, যেমন তাকে দেখা গেছে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে। যদি মানুষের আচরণের নৈতিক ভিত্তি পরিবর্তনশীল থেকেই যায় এবং সমাজ কাঠামো প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে, তাহলে এর ফল চরম বিশৃংখলা ও অসংহতি (Utter chaos and disimtegration) ছাড়া আর কি হতে পারে? মানুষের কাজ নিয়ামক শক্তি (Factors) কর্তৃক সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক শক্তির কাছে অভিভূত বা অবসন্ন হয়ে পড়া নয় বরং তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা। যারা আজ ক্ষমতায় আছে, তারা কিভাবে আমাদের জীবনপদ্ধতিকে যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার অর্জন করলো, একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান (Upheaval) কোনো জাতিকে ক্ষমতার শিখরে নিয়ে যেতে পারে এবং নিয়ে যায়। তারা রাতারাতি আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পেয়ে যায়, যদিও তারা ভূ-পৃষ্ঠের আবর্জনা । মানুষের একটি সহজ প্রবৃত্তি হলো, যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের দোষ-গুণ বিবেচনা না করে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করা। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যেসব ক্ষমতা আবিষ্কার করে তা সমাজ গঠনে ব্যবহার করেছে, তা দিয়ে সমস্ত 'অভাব' মিটানো যাবে না। তাই এগুলোকে পবিত্র কুরআন

www.amarboi.org

প্রদর্শিত মানুষ ও সমাজের প্রতিকৃতির সদৃশ করতে হবে। এরূপ একটি সমাজ এবং এরূপ একটি মানুষ স্থবির হবে না, হবে মুক্ত ও স্বাধীন। সে আল্লাহ্ প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করবে (Evolve to perfection)।

ব্যক্তি ও সমাজে ক্ষতির প্রতিকার করতে হলে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। কুরআন ও হাদীসকে অমোঘ সত্য বলে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করতে হবে। এমনকি পবিত্র কুরআনের একটি শব্দের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার অর্থ, এর সমগ্র সত্যকে নাকচ করে দেয়া, দুর্বল বা নিষ্প্রাণ ধর্ম (A diluted religion) ভেজাল খাদ্যের অধিক কিছু নয়। তা কখনো আমাদেরকে প্রকৃত পুষ্টি এনে দিতে পারে না।

হায়দার বাম্মাত (Haider Bammate) জেনিভায় ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক মে, ১৯৬২-তে প্রকাশিত তার "মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু সিভিলাইজেশন" (Muslim Contribution to Civilisation') নামক গ্রন্থে ইউরোপীয় রেনেসাঁর দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কলা, কৃষ্টি ও শিল্পে মুসলমানদের মূল্যবান অবদানগুলোর উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন এ বৈষয়িক কীর্তিগুলো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত প্রশংসনীয়। মানবতার কাছে ইসলামের আধ্যাত্মিক অবদানের শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ একটি শব্দও তাতে নেই। পড়লে মনে হবে, গ্রন্থকার এরূপ কথা উল্লেখযোগ্য বলে মোটেই ভাবেননি। তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) তাকবীর অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ই সত্যিকারের বড় এবং তিনি ছাড়া আর কেউই উপাস্য নেই। নামায, যাকাত, রমযানের সাহ্‌রী (The feast of Ramadan) অথবা হজ্জ থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক মেজাজের নৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। মানুষের তৈরি আইনের উন্নয়নে শরীয়তের অবদান সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। অথচ ইসলামের এ আধ্যাত্মিক দানের (Gifts) পাশে, ধর্ম নিরপেক্ষ কলা ও বিজ্ঞানে মুসলমানদের বৈষয়িক কীর্তিসমূহ তাৎপর্যহীন।

মুসলিম বিশ্ব থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানকে মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রেরণ করাটা ছিলো পাশ্চাত্যের প্রগতির ক্ষেত্রে এক অবিমিশ্র আশীর্বাদ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, এটা ছিলো এক মারাত্মক দুর্ঘটনা (Catastrophe)। আমাদের শত্রুদের যে জ্ঞান আমরা উদার চিত্তে (So magnanimously) বিলিয়ে দিয়েছি তাকেই তারা আমাদের সর্বব্যাপী ধ্বংসের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। আমরা যে বৈষয়িক জ্ঞান তাদেরকে দিয়েছি, তারা নিঃসন্দেহে প্রচণ্ডরূপে তার সদ্ব্যবহার করেছিলো। এ জ্ঞানের উৎসের জন্য সামান্যতম শ্রদ্ধানুভূতিও তাদের মনে কখনো জাগেনি। তাদের ষড়যন্ত্র ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। যে

www.amarboi.org

আকারে (Extent) ইসলামী সভ্যতা পাশ্চাত্যের সভ্যতার অগ্রদূত (Forerunner) কেবলমাত্র সে প্রেক্ষিতে ইসলামী সভ্যতার করতে গেলে এর অর্থ হবে, ইতিমধ্যেই ইসলাম ইতিহাসে তার মিশন সম্পন্ন করেছে এবং এখন হতে একটি স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে এর কোনো ভবিষ্যত নেই। কিন্তু হায়দার বাম্মাত-এর বইয়ে উল্লিখিত বিষয়াদির চেয়ে মানবতাকে দেবার মত আরো অফুরন্ত সামগ্রী রয়ে গেছে ইমলামের ভাণ্ডারে।

দূর অতীতের অবদানেই শুধু আমাদের গর্ব সীমিত রাখা উচিত নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যতে ইসলামের অবদান সম্পর্কে কি বলা যায়? এর নৈতিকতা ও আইনের পদ্ধতি আধুনিক বিশ্বের কাছে একান্ত প্রয়োজন। একই সাথে ইসলাম একক ব্যক্তিত্বের মুক্তি প্রদান ও সমাজ সংহতি দৃঢ় করতে পারে।

"যুগের" প্রয়োজনের উপযোগী করতে গিয়ে আমাদের আদর্শের যে কোনো ধরনের সংশোধনী প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতে আমরা যতো প্রবলভাবেই বাধ্য হই না কেনো এ আদর্শ আধুনিক মনের পক্ষে প্রাসংগিক ও উপলব্ধিযোগ্য করতে হলে তার প্রচার পদ্ধতি পরিবর্তনের (Adaptation) জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। এর অর্থ আমি এটা বুঝাতে চাই না যে, প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান 'মৌলবাদী'দের (Fundamentalists) মতো সস্তা বাণিজ্যায়ন (Commercialism) ও নাটকীয় নৃত্যরাজির (Theatical Acrobatics) মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রচার কার্য চালাবো। এসব বিষয়ে খৃষ্টান মৌলবাদীদের অনুকরণ করতে গেলে তা হবে আমাদের মিশনের নিকৃষ্টতম সম্ভাব্য ক্ষতি। মধ্য যুগের ইউরোপে যখন সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল "এক সময়ে একটি সূচিকাগ্রে কতগুলো ফেরেশতা নাচতে পারে," তখন ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যুক্তিসমূহই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়েছিলো। মধ্যযুগে ইহুদীদের সেরা ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন মূসা মাইমোনিডিস (Moses Mgimonides)। তিনি তার "দি গাইড টু দি পারপ্লেক্সড (The Guide to the Perplexed) বইয়ে প্রাচীন গ্রীক যুক্তিবাদী দর্শনকে ইহুদীবাদের সাথে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন এবং ইহুদীবাদ খৃষ্টান ধর্ম বা ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মধ্যযুগের একজন ধর্মতত্ত্ববিদ সেন্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas) এর "সুম্মা থিওলজিকা (Summa Theologica) গ্রন্থটি আজও রোমান ক্যাথলিক মতবাদের প্রধান প্রমানিক উৎস বলে স্বীকৃত। একুইনাস ও মাইমোনিডিস ভালোভাবেই আল-গাযালী র.-এর 'তাহাফাত আল-ফালাছিফাহ' (The Inchoherence of the Philosopheis)-এর মতো কীর্তি উপলব্ধি করতে

www.amarboi.org

পেরেছিলেন। আর তেমনি পেরেছিলেন সমস্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান যারা ধর্মতত্ত্বের এই পরিবেশে (Theological Atmosphere) চিন্তার ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের প্রশ্নে ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানদের আগ্রহ অত্যন্ত গভীর ছিলো, ততদিন পর্যন্ত 'তাহাফাত আল-ফালাছিফাহ'-এর মতো বই অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং ভেতর থেকে ইসলাম বিরোধিতায় বাঁধা প্রদান করার (Combatting heresy from within) আদর্শ অস্ত্র ছিলো। আজ তাহাফাত আল-ফালাছিফাহ তাবলীগের উপযোগী করা না হলেও এর যুক্তি সত্য থেকে অপসৃত হবে না ; আর এর বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যিক গুণাবলীও কমে যাবে না। এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে আধুনিক মনের আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবার কারণে অবোধগম্য না হলেও এর যুক্তিগুলো সম্যকরূপে অপ্রাসংগিক বলে মনে হবে। তবুও আমাদের ঐতিহ্যবাদী (Traditionalist) মাদ্রাসা-গুলোতে শিক্ষা আল-গাযালী রহ.-এর দিন থেকে প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এমনিভাবে ঐতিহ্যবাদী উলামাগণ মুসলিম মিল্লাত সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে এখনও মুতাজিলা মতে (Mutazilite Heresy) ডুবে আছেন। অথচ আজ মুসলমানদের মার্কসবাদ, ডারউইনবাদ, ফ্রয়েডবাদ ও অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে।

যদি আমরা ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলামের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করি, তাহলে আধুনিক মন আমাদের যুক্তি বুঝতে পারবে, এটা আমরা কখনোই আশা করতে পারি না। আধুনিক মন বুঝবে কেবল প্রয়োগবাদ (Pagmatism)। তাবলীগের প্রচেষ্টায় আমাদের অবশ্যই সে তথ্যের পূর্ণ হিসেব নিতে হবে। আধুনিক মন বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি অনেকটা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে পারবে, যদি আমরা ধীর-শান্তভাবে অকাট্য তথ্যের (Irrefutable Facts) ভিত্তিতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, সাধারণভাবে ব্যক্তি, তার পরিবার আর বন্ধুত্ব ও মানবীয় সম্পর্কের ওপর নাস্তিকতার ফল কি ভয়াবহ। মানসিক অসুস্থতার মারাত্মক পরিণতি ও ধ্বংসাত্মক দিক, অবাধ মেলামেশা ও কাম নিবৃত্তি, যৌনব্যাধি ও অবৈধ সন্তান, ললিত কলা (Arts) ও বিনোদনের ক্ষেত্রে অশ্লীলতা, বিবেকহীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের পাশবিকতা প্রভৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

যদি আপনারা নাস্তিক্য ও বস্তুবাদ চান, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই মানবীয় বন্ধনের ও পরিবারের পতন চাইতে হবে। এ অসংহতি এবং পরিবারের পতন আজ প্রতিটি অগ্রসর দেশের মানুষ মর্মে মর্মে হৃদয়ংগম

www.amarboi.org

করতে পেরেছে। এ প্রসংগে লণ্ডনের এক বৃদ্ধা রমণীর জীবন কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করছি ঃ তিনি একাকী বসবাস করতেন। একদিন তার কক্ষে সবার অজান্তে মারা যান। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিধবা হয়ে তার সব বন্ধুর চেয়ে দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন তিনি। তিনি প্রায় সমস্ত যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং পীড়িত ও দুর্বল হয়ে তার কক্ষে আবদ্ধ হন। কিছুদিন পর পিয়ন দেখতে পেলো যে, তিনি ডাকবাক্স থেকে তার পত্রাদি সংগ্রহ করেননি। যে গোয়ালা তাকে দরজায় বোতলে করে দুধ দিয়ে যেতো সেও দেখলো যে, দরজা থেকে দুধের বোতল ভেতরে নেয়া হয়নি। শেষে পিয়ন নোংরা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ বাইরে থেকে খিল দেয়া দরজা ভেংগে ভেতরে ঢুকে বৃদ্ধাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখতে পেল। তার শেষ কৃত্য পালনের মতো কোনো আপনজন বা বন্ধুও সেখানে ছিল না। আরেক চৌদ্দ বছরের বালকের কাহিনী সংক্ষেপে বলছি ঃ বালকটি তার এক শিক্ষিকার স্কার্টের ভেতর উঁকি মেরে দেখে। শিক্ষিকা সে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালকে নালিশ করেন। প্রিন্সিপাল বালককে কেন সে তা করেছিলো জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয় আমি ঠিক ওখানে কি আছে তা দেখতে চেয়েছিলাম।

যে মুসলমান আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপকে প্রগতির আদর্শ বলে ধরে নেন। তাকে আমি নিউইয়র্কের যে কোনো একটি সরকারী মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করে বার্ধক্য বিভাগগুলোতে যাওয়ার (To go to the senile wards) অনুরোধ করবো। এ বিভাগগুলোতে পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত বয়স্ক লোকেরা গবাদী পশুর মতো উলংগ ও অপবিত্র (Incontinent) অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুণছে। অথবা নিউইয়র্কের গলি পথে চললে দেখতে পাবেন, মদ্যপায়ী ও ভোগপায়ী (Dope Addicts) প্রকাশ্য রাস্তায় এবং জনসমক্ষে পাশবিক কামনিবৃত্তি করছে। অথবা কোনো মানসিক ব্যধি চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলে আপনাকে নিশ্চিত করে বলবে, "চিত্ত বিকৃতি বিশ শতকের আধুনিক সভ্যতাকে বিদ্রুপ করছে।" তবুও স্বদেশী ও বিদেশী উভয় মর্ডানিষ্টরা একথার ঢোল পেটাতে কখনোই ভুলে যাচ্ছেন না যে, অতীতে যা মহত ও উন্নত ছিলো, তাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে কেউ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল উপভোগ করতে পারবে না। নিজেকে আধুনিকি করণে উৎসুক প্রতিটি জাতিকে এ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু আমরা কি আমাদের ঐতিহ্যের বদলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বহানী (Depersonalization) নৈতিক বিশৃংখলা ও সামাজিক অধপতনকে গ্রহণ করবো ?

www.amarboi.org

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা যদি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিক প্রগতির পথে কোনো বাধার সৃষ্টি না করে, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনুসরণের উৎসাহ দেয়, তাহলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে যেভাবে অনুধাবন করা ও প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি হওয়া উচিত ? সমস্ত ফলিত জ্ঞান মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। শুধু দক্ষিণ আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপের একাধিকবার নয়, যা বলে মিঃ চার্লস মালিক ও তার বন্ধুরা আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো সংস্কৃতির সমস্ত বিষয় পরস্পর সংযুক্ত। সে সংস্কৃতি তার অন্তর্নিহিত দর্শন বা মতবাদ কর্তৃক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হয়। বিগত তিন শতক ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা কোনো ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল নাস্তিক্যতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরিবার, সমাজ ও সমস্ত মানব সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে এবং এরূপ অবস্থা বিরাজমান থাকলে এ বিজ্ঞানের যান্ত্রিক শক্তিগুলোর শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এগুলো কেবল কার্যকারণ ও ফলাফলের প্রাকৃতিক নিয়ম। যতোদিন পর্যন্ত মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ছিলো, ততোদিন থেকে সংশয়ও ছিলো। নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের বয়স প্রায় মানবজাতির বয়সের সমান। আজকের অশুভ শক্তি অতীতে বহুবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু যখন অশুভ শক্তির নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন তার বীভৎসতা আমাদের পূর্বপুরুষদের জঘন্যতম কল্পনারও সীমা ছাড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞান মোটের উপর যা করতে পারে তা হচ্ছে, মানুষের কল্যাণ, স্বাচ্ছন্দ ও ভৌতিক শক্তি (Pheysical Powers)) বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক উপাদান-গুলোকে একত্রিত করা। কিন্তু বিজ্ঞান তার স্বভাবের কারণেই কোনো নৈতিক নির্দেশনা বা আত্মার খোরাক যোগাতে অক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ আগুনের আবিষ্কারের কথা বলা যায়। আগুন একই সাথে সবচেয়ে গঠনক্ষম ও প্রয়োজনীয় এবং ধ্বংসাত্মক ও ভয়ংকর শক্তি। তিন শতকেরও বেশী কাল ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিকগণ বিশ্বকে বলে আসছেন যে, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের যুগে ধর্ম বিশ্বাসকে অনিবার্যভাবে বাতিল করে দিতে হবে। সিগমান ফ্রয়েডও বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে কেবল এক নির্বোধ মায়া (Childish Illusion) ও অলীক দর্শন, যা আমাদের সহজাত স্বাভাবিক কামনা (Instructive Desires) পূরণে সক্ষম এমন কাকতালীয় ঘটনা (Coincidence) থেকে এর শক্তি অর্জন করে। এখন প্রশ্ন জাগে, যদি স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট এ সহজাত স্বাভাবিক কামনাগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে

www.amarboi.org

সন্তুষ্টি চায়—এ বিশ্বাস মানব জাতির মধ্যে এত গভীর যে এটা ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজ প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে না—তাহলে ধর্মীয় সত্য হবে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা (OBJECTIVE REALITY)।

যে খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র প্রায় পনেরশত বছর ধরে পাশ্চাত্য জগতকে শাসন করেছে তার ধারণা হচ্ছে প্রতিটি মানব শিশু পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কারণ মানবীয় প্রকৃতি সহজাতভাবে খারাপ। তাই জীবনে ধর্মীয় আইন নিষ্প্রয়োজন এবং ধর্মীয় আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ সাফল্য লাভের আশা করতে পারে না। খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদগণ জোর দিয়ে বলেন, সৎগুণাবলী (Virtue) কোনো আইনের বাধ্য হতে পারে না বরং তা শুধু অন্তর থেকে আসতে পারে। এজন্য ধর্ম সমাজের উপকারে লাগতে পারে না, কেবল ব্যক্তিগত ঈশ্বর ভক্তিতে সীমিত থাকতে পারে। এখানেই ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের পার্থক্য। খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদগণ তাদের লেখনির মাধ্যমে অনবরত প্রচার করেন, ইসলামে পাপের সমস্যার কোনো উত্তর নেই। বরং তারা এটাও বলেন যে, আমরা মুসলমানগণ যারা ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করি, মানব প্রকৃতির আসল সত্তা সম্পর্কে অসংশোধনীয়রূপে অজ্ঞ (Incurably Ignorant)

মানব প্রকৃতিতে পাপ সহজাত, একথা জোর করে বলার পথে খৃষ্ট ধর্ম কোনো প্রামাণিক তথ্য বিবৃত করছে না, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য এটা যে আংশিক সত্য তারা তা ভুল ধরে নিয়েছে। হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো সমাজের প্রতি খৃষ্ট ধর্মের দৃষ্টিভংগী গভীরভাবে দুঃস্থবাদী। খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব পাপ ও পাপময়তার (Evil & Sinfulness) প্রকৃতি সম্পর্কে যা প্রচার করেছে, তা যদি আমাদের করতে হতো তাহলে সৎগুণ সম্পন্ন ও অনুভূতি সম্পন্ন যেসব মানব মানবী সমাজের দূর্নীতি সহ্য করতে পারতো না, তাদের পক্ষে বন-জংগল ও মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়ে সন্যাসী-সন্যাসিনী সাজা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না।

মানুষের প্রকৃতির প্রতি ইসলাম বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগীর পোষণ করে। এর উদাহরণ পাওয়া যায়, যখন পবিত্র কুরআন বলে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

"নিশ্চয়ই আমরা মানব জাতিকে উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তাকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে অধঃপতিতদের সর্বনিম্নে ফেলে দিয়েছেন, সেসব লোকদের ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।"–সূরা আত তীন ঃ ৪-৬

www.amarboi.org

ইসলাম মানুষের মনের পাপকে উপেক্ষা করেনি, বরং তাকে স্বীকার করে নিয়েই খৃষ্ট ধর্মের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে, মানবজাতি জন্মগতভাবে উত্তম ঃ "কুল্লু মাওলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরাত।" ভালো ও মন্দ পাশাপাশি থাকে। একটি মানুষের জীবন তার অন্তস্থ (Good within himself) তার অশুভ আবেগের ওপর বিজয় লাভ করতে সমর্থ করার এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। এ থেকেই আসে চরিত্রের খাটি মহত্ব এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ইসলাম জীবনকে এক আনন্দ ভ্রমণ বলে মনে করে না, বরং একে এক পরীক্ষা বলে ধরে নেয়। এ পরীক্ষার শেষ ফল জানা যাবে এবং বিচার করা যাবে একমাত্র পরকালে। পৃথিবীতে যদি কোনো মন্দ না থাকতো, তাহলে কোনো ভালোও থাকতো না। দুঃখ না থাকলে সুখও থাকতো না এবং আমরা যদি কদর্যকে না জানতাম তাহলে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাও লাভ করতে পারতাম না।

ঈমান বাধ্য করে আনানো যায় না। এটা একটা দান যা একমাত্র আল্লাহ দিতে পারেন। এখন পাশ্চাত্যের খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদগণ বলবেন, যদি ঈমান বাধ্য করে আনানোই না যায়, তাহলে আমাদের ধর্মীয় আইনের উদ্দেশ্য কি ? ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি ? তারা এ পর্যন্ত ঠিক আছেন যে, মানুষের প্রকৃতিতে সহজাত পাপ (Inherent Evil) থাকার কারণে এ বিশ্ব কখনো একটি স্বপ্ন রাজ্যে (Utopia) পরিণত হতে পারে না এবং হবেও না কখনো। আমরাও স্বীকার করি পূর্ণতা একমাত্র পরলোকেই লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এ জগতে পরম সামাজিক উৎকর্ষ (Perfection) অর্জন করতে না পারলেও স্বর্গীয় আইনে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ যথেষ্ট উন্নত হতে পারে। ধর্মীয় আইনের প্রবর্তন (Enforcment) পাপাচারকে (Evil) সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলেও তাকে প্রভাবহীন করে দিতে পারে। এমনকি একটি উত্তম ইসলামী রাষ্ট্রেও অপরাধ দেখা যাবে। কিন্তু সে অপরাধমূলক কার্যকলাপগুলো সেসব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকবে, যাদেরকে সবাই ঘৃণা করবে। পাশ্চাত্যে অপরাধমূলক আচরণ মারাত্মক ব্যাধির (Raging Epidemic) আকার ধারণ করেছে। কেনো ? সমকালীন সংস্কৃতি অপরাধমূলক কর্মকে (Evil) সামাজিক মূল্যবোধের উৎস বলে গ্রহণ করেছে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধান করে দিয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক মূল্যবোধ মানুষকে যা তৈরি করে, সে তাই হয়। কেবল সামাজিক আদর্শের পরিবর্তন করলেই জাতির নৈতিক গুণাবলী আপনা আপনি বদলে যাবে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম বা উপেক্ষা করে উঠতে পারে এমন লোক বিরল।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের মর্মকথা

ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ওপর প্রত্যয়ের নিঃসন্ধিগ্ধ স্বীকৃতি শুধু স্রষ্টা বা প্রতিপালক হিসেবে নয় বরং শাসক ও অভ্রান্ত পথ নির্দেশক হিসেবে, যেহেতু তিনি নবীদের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশাবলী মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তার এ নির্দেশাবলী বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত রূপে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর শিক্ষায়, পবিত্র কুরআন ও সুন্নার ভাষায় এবং তার পরে শরীয়াত শাস্ত্রজদের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হয়ে আজ আমাদের কাছে এসেছে। মানুষের আচরণের ভিত্তি হিসেবে এসব পরম নৈতিক মানের স্বীকৃতি সমাজে স্থিতিশীলতা ও শান্তি এনে দেবে। মানুষের তৈরি আইন অনিবার্যভাবে বিশেষ কোনো জাতীয়তা, সংস্কৃতি বা শ্রেণীর পক্ষপাতিত্বে অবশ্যই ভুগবে এবং দুর্বলদের ক্ষতি করবে। এ দুর্বলরা অবশেষে এ অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এভাবে তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালাতে থাকবে।

যেহেতু শরীয়াত হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত অমোঘ বিধান, সেহেতু কেউ এর আইন বহির্ভূত নয়। যারা ইসলামী আইনকে অমোঘ কর্তৃত্ব ও বিশ্বজনীন সম্মান দান করে, তাদের সবার ক্ষেত্রে ইসলাম নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ধারণা অর্থহীন। এতে ধর্ম, আইন ও সরকার পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্ ও তার নবী রাসূলগণের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়। বাজে গল্প-গুজব, আমোদ-প্রমোদ কিংবা খেয়ালের বসে কাটানোর মতো সময় তার থাকে না। প্রকৃত মুসলমানের জন্য ইসলামই হচ্ছে তার সমগ্র জীবন এবং এর বাইরে তার কোনো জীবন নেই। সবসময়ই তার মন আল্লাহ্‌র চিন্তা এবং পরলোকে তার ভাগ্যের ভাবনায় মগ্ন থাকে।

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ইক্লেকটিজম (সকল মর্মতত্ত্বের সার সংকলন) কিংবা এ জাতীয় সংস্কার সংশোধন বরদাস্ত করে না।

ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইসলামের অপরিহার্য শিক্ষা হচ্ছে ঃ (ক) নামায বা প্রতিদিনের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত। এগুলোর কোনো কোনোটিকে অবশ্যই সম্মিলিতভাবে পালন করতে হবে। নিরন্তর মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকে তাজা রাখার জন্য এবং তাঁর বন্দেগীতে আন্তরিক আসক্তি জাগ্রত রাখার জন্য। (খ) যাকাত বা দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে কারো উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশের আবশ্যিক

www.amarboi.org

প্রদান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কষ্টার্জিত অর্থের কিছু অংশ স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আত্মাকে লোভ ও লালসা থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। (গ) রোযা বা আত্মসংযমের প্রশিক্ষণ হিসেবে সমগ্র রমযান মাস ধরে দিনের বেলায় উপবাস, যার ফলে আত্মার মুক্তির জন্য দেহের বৈষয়িক দাবীসমূহ গৌণ করা যেতে পারে। (ঘ) হজ্ব বা আল্লাহর ইবাদাতের ভিত্তি হিসেবে জাতি, শ্রেণী এবং জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাতের ভ্রাতৃত্বভাব এবং বিশ্বজনীন ঐক্য বজায় রাখার জন্য মক্কায় হজ্ব অনুষ্ঠান পালন। (ঙ) জিহাদ বা আল্লাহর পথে সংগ্রাম এর দাবী হচ্ছে প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে তার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করবে, ধর্মপরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্তর ও বাইরে থেকে পাপকে পরাভূত করে সে উদ্দেশ্যে যে কোনো কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হবে। ইসলাম তথা নবী করীম স.-এর উম্মতের কাজে সে তার সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এ আনুগত্য জাতিগত, শ্রেণীগত, ভৌগলিক ও ভাষা সংক্রান্ত সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে যায়। তাই আল্লামা ইকবাল লিখেছেন, ইসলাম ছাড়া মুসলমানদের কোনো দেশ নেই।

ইসলামী আন্দোলনের দ্বিতীয় অর্থ সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের স্বীকৃতির মাধ্যমে পশ্চাৎপদতার বিলোপ সাধন করা এবং এ সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তিগুলোকে নাস্তিকতার অভিশাপমুক্ত করা। অতীতে মুসলিম বিজ্ঞানী যেমন ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি হবে—সে হবে তার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রয়োগের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী। সে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কোনো সম্ভাব্য অপব্যবহারকে যথাসম্ভব খর্ব করবে। তাই আমরা মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমাদের নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ তা হাসিলের জন্য এর ব্যবহার করবো। যখন আমরা এটা অর্জন করবো, তখন আধুনিকীকরণের অর্থ আর অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করাকে বুঝাবে না। যদিও বৈষয়িক উন্নতির প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে তবুও আমরা যন্ত্রের প্রভু হতে চাই, দাস হতে চাই না। বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই।

সর্বোপরি সমকালীন শহরে জীবন যাত্রার মতো মানবিক গুণ বিবর্জিত ও বিলাসবহুল জীবন যাপনে আমরা অংশ নিতে প্রস্তুত নই। আমরা প্রতিষ্ঠা করবো প্রতিবেশী সুলভ মিত্রতা, বলিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন ও একটা সুসংবদ্ধ সমাজ। যিনি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের শেষ উৎপাদন দেখতে চান

www.amarboi.org

তাকে শুধু এতটুকুন অনুরোধ, নিউইয়র্কের ফ্রকলিনে বিকারগ্রস্ত শিশুদের স্কুলটি পরিদর্শন করুন। সেখানে দেখতে পাবেন, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত শিশুরা কামরার একই কোণে বসে তাদের জাগ্রত অবস্থা একটি যন্ত্রের শব্দ ও গতি অনুকরণ করে কাটিয়ে থাকে। যদি কাউকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন, তাহলে সে জিদ করে বলবে যে, তার কোনো নাম নেই, কারণ সে মানুষের বংশোদ্ভূত নয় সে একটি যন্ত্র। এরূপ মানসিক বিকারগ্রস্ত বালক বালিকারা হচ্ছে শুধু তাদের অস্বাভাবিক পরিবেশের শিকার।

ইসলামী আন্দোলনের তৃতীয় অর্থ আইনের শাসন। আমরা চাই গণতান্ত্রিক ও আইনসম্মত উপায়ে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন। সর্বোপরি সংখ্যাগুরু হই বা সংখ্যালঘু হই, আমরা আইন পালনকারী নাগরিক। এমনকি সে আইনও মেনে চলি, যেগুলোর আমরা বিরোধিতা করে পরিবর্তন করতে চাই। ইসলামী আন্দোলন গোপন, ধ্বংসাত্মক বা সন্ত্রাসবাদী কোনো কৌশল সমর্থন বা অবলম্বন করে না। আমরা ধর্মান্ধ বা ধর্মোন্মাদ নই, শান্তি ও যৌক্তিক হেতুর (Logical Reason) ভিত্তিতে আমাদের বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। আমরা অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং যাতে সর্ব সাধারণের মতামত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা করি। যেসব নির্দয় নিপীড়ক আমাদের আদর্শের প্রচার কার্যকে অসম্ভব করে তুলবে তাদের উৎখাত করার জন্য আমরা অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করবো। জিহাদের অর্থ কখনো কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র আমাদের কাজের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। আর যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয়ার মৌলিক মানবিক অধিকারকে নিশ্চিত করা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। সেহেতু আমরা চলমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বো।

আল্লাহর মনোনীত সমস্ত নবী রাসূলের শিক্ষাকে আমরা ধরে রাখবো। ইবরাহীম আ., মূসা আ. ও ঈসা আ. আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ স. যা প্রচার করেছেন, তার সবকিছুই আমরা অনুশীলন করতে চাই। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল, ম্যাকিয়ভেলী, ভলতেয়ার, ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড, সার্ত্রে বা কামু-এর কাছ থেকে নৈতিক বা সাংস্কৃতিক নির্দেশনা নেয়ার দরকার নেই। আমরা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, বস্তুবাদী দার্শনিকদের আদর্শগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তারা যা কিছু তুলে ধরেছেন তার সবই অকল্যাণজনক। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, মানুষের তৈরী দর্শনকে আমাদের আদর্শের উৎস হিসেবে গ্রহণের বর্তমান প্রবণতা বন্ধ

www.amarboi.org

না হলে এর ফল হবে সমগ্র মানবজাতির বিনাশ সাধন। আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ না করা এবং মানুষের তৈরি দার্শনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা—এ দু'টোর মধ্যে মীমাংসা করার যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে আমরা নিরর্থক এবং হতাশাব্যঞ্জক বলে গণ্য করবো।

ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে অধিকারের দাবীর তোয়াক্কা না করে কর্তব্য পালনের ওপর জোর দেয়া। বস্তুবাদের শাসনাধীনে সবাই নিতে চায়, কিন্তু কেউ দিতে চায় না। যখন ইসলামী আদর্শ কার্যকর হবে, তখন যারা অন্যের সেবা করে তারা সমাজে পুরস্কৃত হবে। দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা তখন নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রচলিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলোকে সক্রিয় জনমতের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা মাত্র বস্তুবাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা নির্মূল হয়ে যেতে পারে এবং অবশ্যই যাবে। ইতিহাস কেবল কোনো যান্ত্রিক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নয়। মার্কসবাদের প্রবক্তারা এ বলে আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে চান যে, ইতিহাসের ওপর আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আসলে এটা ঠিক নয়। ইতিহাস যথেষ্ট প্রমাণ দেয় যে, ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে ভালো হোক মন্দ হোক, জনগণ যা চায় তাই অর্জন করতে পারে, যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক এটা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চায়।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

※ পর্দা ও ইসলাম
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

※ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

※ মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

※ মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
- অধ্যাপক গোলাম আযম

※ মহিলা সাহাবী
- তালিবুল হাশেমী

※ সংগ্রামী নারী
- মুহাম্মদ নূরুয্যামান

※ মহিলা ফিকহ(১-২ খণ্ড)
- আল্লামা আতাইয়া খামীস

※ ইসলাম ও নারী
- মুহাম্মদ কুতুব

※ ইসলামী সমাজে নারী
- সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী

※ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ

※ পর্দা প্রগতির সোপান
- অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম

※ একাধিক বিবাহ
- সাইয়েদ হামেদ আলী

※ নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার
- শামসুন্নাহার নিজামী

※ নারী মুক্তি আন্দোলন
- শামসুন্নাহার নিজামী

※ পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
- শামসুন্নাহার নিজামী

※ আদর্শ সমাজ গঠনে নারী
- শামসুন্নাহার নিজামী

※ পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?
- সাইয়েদা পারভীন রেজভী